মহাকাশের বুকে পৃথিবী

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী



মহাকাশের বুকে পৃথিবী

শঙ্কর চক্রবর্তী

বেস্টবুক্‌স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

MAHAKASHER BUKE PRITHIVI
By Sankar Chakrabarty

প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৮৬ (২২০০ কপি)
দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯০

ISBN 81-85252-24-6

প্রকাশক :
বেস্ট বুক্‌স্
১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :

মিত্র প্রেস
৮১,বি পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

কভার ছেপেছেন :
দি মডার্ণ প্রসেস
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : তিরিশ টাকা (৩০'০০)

উৎসর্গ

স্নেহের

তুলু, রেখা, শিশির, রত্না, দীলু, মঞ্জু, মান্নু,
পিকু, সন্তোষ, চন্দনা, অশোক ও ঝরণাকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা
পৃথিবীর কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত)
মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ (তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
আকাশের কথা
মানুষ ও কয়েকটি সামাজিক প্রাণী (তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
চন্দ্র অভিযান (দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত)
মহাকাশের কথা

ভূমিকা

পৃথিবীকে ঘিরে আমাদের অগণিত প্রশ্ন। পৃথিবীর সৃষ্টি কিভাবে হল, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, যেমন পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, অরণ্য, মরুভূমি, মেরুপ্রদেশের তুষারাবৃত অঞ্চল প্রভৃতি—এরাই বা গড়ে উঠল কিভাবে, এই প্রতিটি উপাদানকে ঘিরে বিরাজ করছে এক বিরাট বিস্ময়ের রোমাঞ্চ। প্রকৃতির এই বিরাট নাটমঞ্চ জুড়ে যে বিচিত্র ঘটনাবলী রূপায়িত হয়ে চলেছে, মানুষের ভূমিকা তার সামনে আজ শুধু নীরব দর্শকের মত নয়। এই বিরাট পট পরিবর্তনের পেছনে যে কলকাঠির নড়াচড়া রয়েছে, তাকে কিছুটা পরিমাণেও যদি পরিকল্পিতভাবে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যায়, এটাই হল এযুগের বিজ্ঞানীদের কাছে স্বপ্ন।

আমাদের এই পৃথিবী কি চিরদিন বাসযোগ্য থাকবে, এ প্রশ্নের জবাবটাও আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য লংঘিত হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে আবার তারই পাশাপাশি রয়েছে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের বিভীষিকা, পারমাণবিক উচ্ছিষ্টের বিলিব্যবস্থার সমস্যা এবং পারমাণবিক যুদ্ধে প্রাণীজগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের বিপদ সংকেত।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও যুক্তিবিচারের মাধ্যমে একটি ঘটনার পারম্পর্যকে বিচার করা—সেখানেই হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। বেশির ভাগ কল্পকাহিনীর রচয়িতারা এই পারম্পর্যের মূলে কুঠারাঘাত করতে চান। বারমুডা ট্র্যাংগল ও উড়ন্ত চাকী হল এজাতীয় দুটি ঘটনা।

'মহাকাশের বুকে পৃথিবী' গ্রন্থে এজাতীয় বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধাকারে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো দৈনিক আজকাল পত্রিকার রবিবাসরে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৪

সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলো পরিকল্পনা ও প্রকাশনার পেছনে আজকাল রবিবাসরের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীসমীর দত্ত যে আন্তরিক আগ্রহকে প্রকাশ করেছিলেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এই গ্রন্থে লেখাগুলোকে পরিমার্জিত ও কোথাও কোথাও পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

আজকালে প্রকাশিত লেখাগুলো সে সময়ে পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। লেখাগুলো একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে আমার পরম স্নেহভাজন বেষ্ট বুক্‌সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিন্দু ভট্টাচার্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বিশেষভাবেই ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

২রা অক্টোবর
১৯৮৬

২৮৯/সি, বাপুজী নগর,
কলকাতা-৭০০০৯২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মহাকাশের বুকে পৃথিবী' বইটির প্রথম সংস্করণ চার বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুটা সংশোধিত ভাবে ছাপা হল। আশা করি বইটি পূর্বের মতই পাঠকদের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

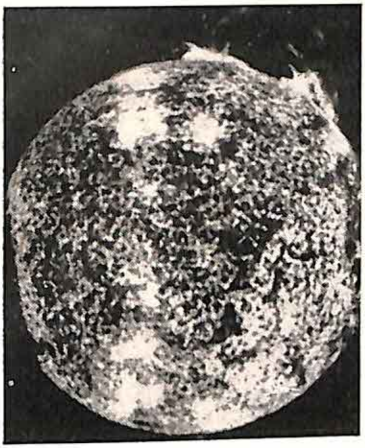
১৪ই নভেম্বর ১৯৯০ শঙ্কর চক্রবর্তী

সূচীপত্র

বইয়ের প্রচ্ছদের ছবিতে আমরা দেখছি চাঁদের দিগন্ত পেড়িয়ে চাঁদের মহাকাশের বুকে পৃথিবী ধীরে ধীরে ধরা দিচ্ছে। চাঁদের জমির প্রায় একশ কিলোমিটার দূর দিয়ে চাঁদকে পরিক্রমাকালীন অবস্থায় পৃথিবীর অভিযাত্রীরা এই অসামান্য ছবিটি তুলেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Astronomy : The structure of the universe by W. J. Kaufmann
2. Exploration of the solar system by W. J. Kaufmann
3. The Quiet Sun by N. Pushkov & B. Silkhin
4. We are not alone by Walter Sullivan
5. The Himalayas by Nigel Nicolson
6. Geography of the Himalayas by S. C. Bose
7. The sea by Leonard Engel and the editors of Life
8. Oceans : general editor G. E. R. Deacon
9. The Oceans by Robert Barton
10. Ocean science and technology by A. K. Malhotra
11. Planet earth : Scientific American reader
12. The Poles by Willy Ley and editors of Time-life
13. Antarctica Ahoy by J. Smuul
14. Antarctica by V. Lebedev
15. Geochemistry for everyone by A. Fersman
16. Only one earth by Barbara Ward and Rene Dubos
17. Losing Ground by E. P. Eckholm
18. Air and water pollution by G. Leinward
19. Man, society and environment by Institute of geography, USSR academy of sciences
20. Arena of life by Milne
21. Fate of the earth by J. Schel
22. Nuclear War : The medical and biological consequences by Chazov, Ilyin and Guskova
23. Hazards of Nuclear Power by A. Roberts & Z. Medvedev
24. Nuclear Madness by H. Caldicott
25. The Bermuda Triangle by Charles Berlitz
26. Without a trace by Charles Berlitz
27. The Bermuda Triangle : mystery solved by Lawrence Kusche
28. Scientific studies of unidentified flying objects : a report by Colorado Project
29. Was God an astronaut ? by E. F. Danniken
30. The world of flying saucers by Menzel and Lyle G. Royd



সূর্যের আলোকমণ্ডল। সূর্যের পৃষ্ঠ-ভাগের তাপমাত্রা ১১০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট।



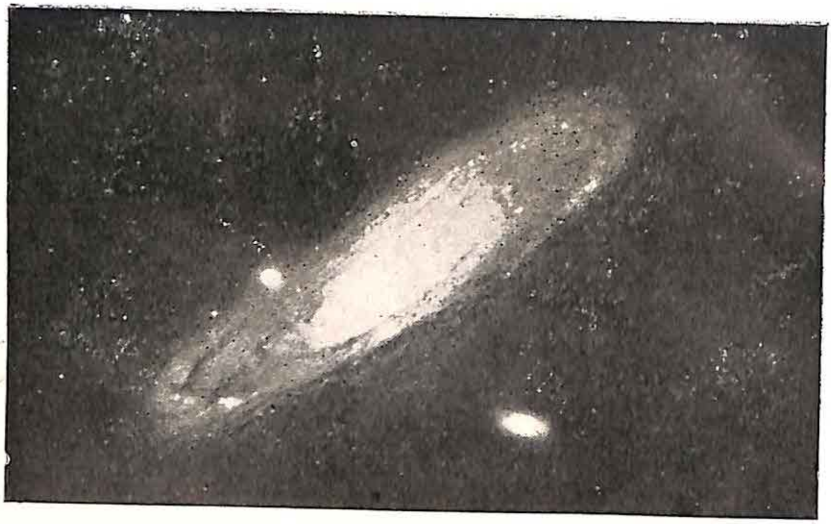
পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের দেহ সূর্যের আলোকমণ্ডলকে আড়াল করার জন্য সূর্যের করোনা বা গ্যাসীয় মণ্ডলের ঝকঝকে উজ্জ্বল চেহারাটি ধরা পড়েছে।



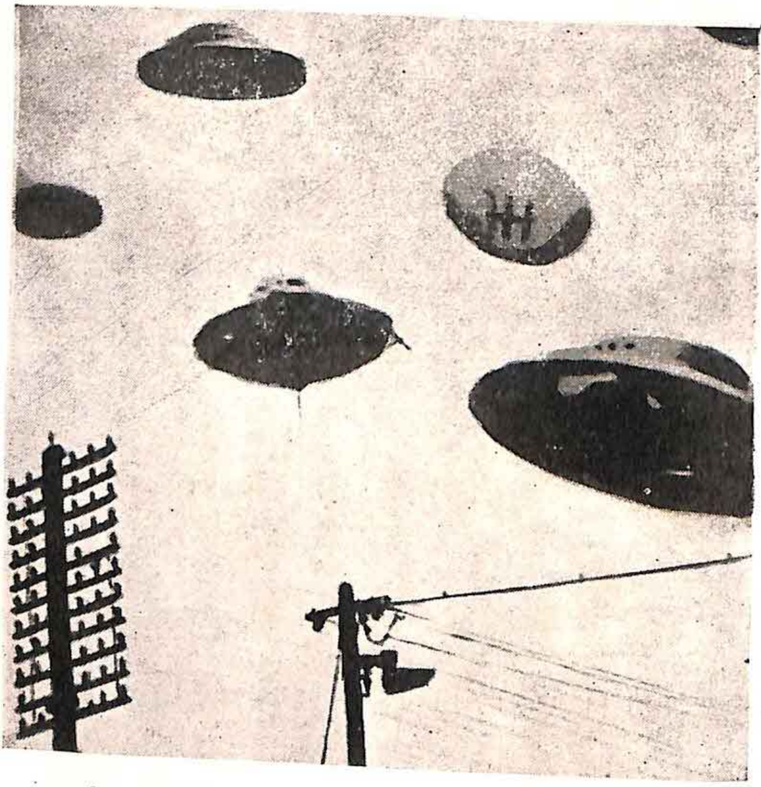
মেঘনাদ সাহা। সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যার জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম।



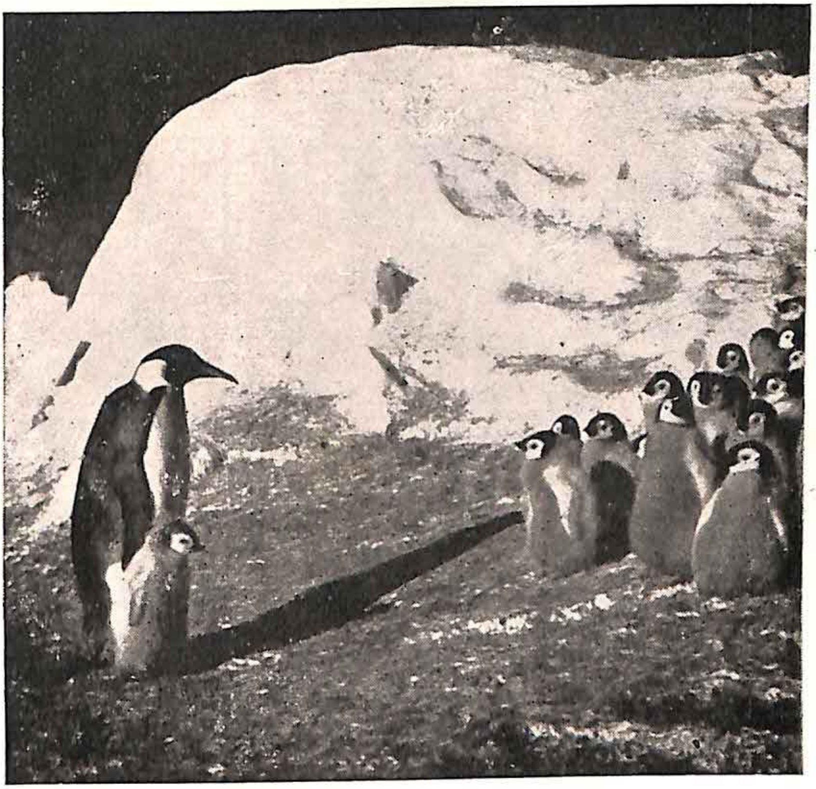
সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। 'চন্দ্রশেখরের মাত্রা' জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।



আমাদের প্রতিবেশি তারাজগৎ অ্যান্ড্রোমিডা। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০০০০ কোটি তারা। আমাদের তারাজগৎ ছায়াপথের চেহারাও হুবহু একইরকম কুণ্ডলীপাকানো এবং তারার সংখ্যাও সমান। ছবিতে ধুলো আর গ্যাসের অনেক মেঘকেও দেখা যাচ্ছে, যাদের নাম দিয়েছি আমরা নীহারিকা। (মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ)।



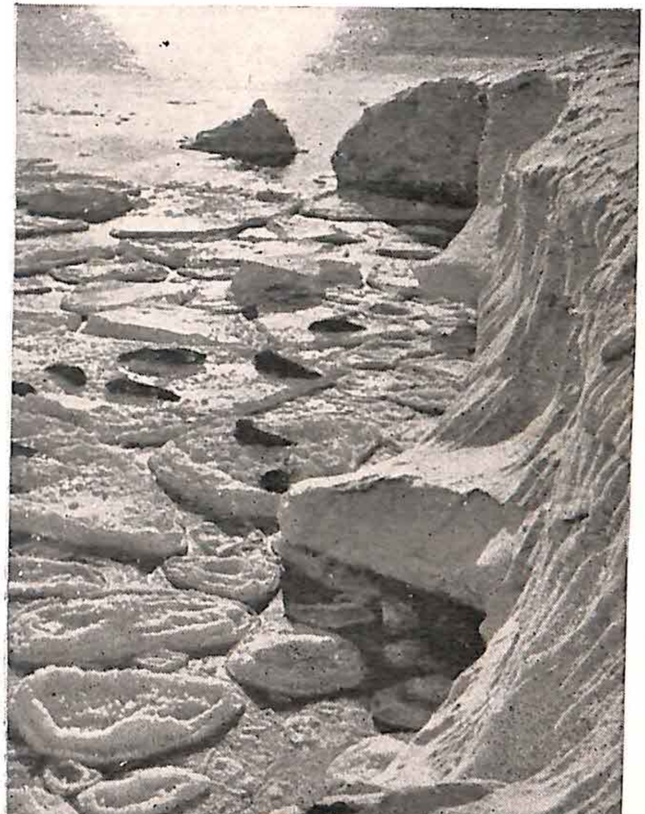
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শকের দৃষ্টিতে উড়ন্ত চাকীর বিভিন্ন রূপ। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানে এ জাতীয় প্রায় প্রতিটি ঘটনাই দৃষ্টির বিভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে। (উড়ন্ত চাকীঃ রহস্য ও সত্য)।



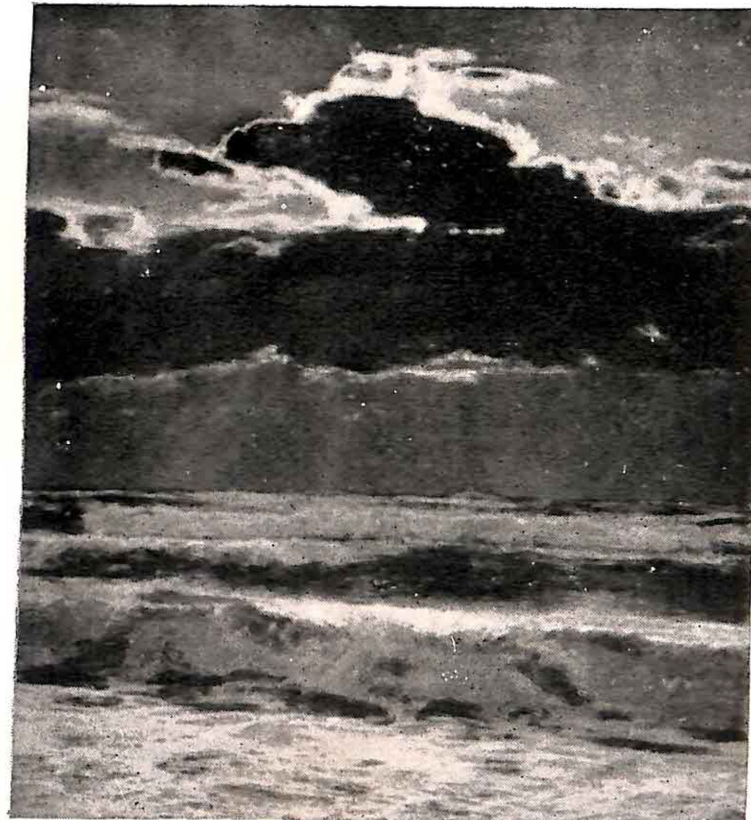
একটি বয়স্ক পেঙ্গুইন একদল বাচ্চার ওপর খবরদারী বজায় রেখেছে। পেঙ্গুইন বাচ্চাদের বয়স যখন চার থেকে ন' সপ্তাহ তখন এ জাতীয় এক ধরনের নার্সারিতে ওদের জমা করে দিয়ে বাপ-মা দুজনেই খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে সাগরে।
(হিমাবৃত মহাদেশ কুমেরু)



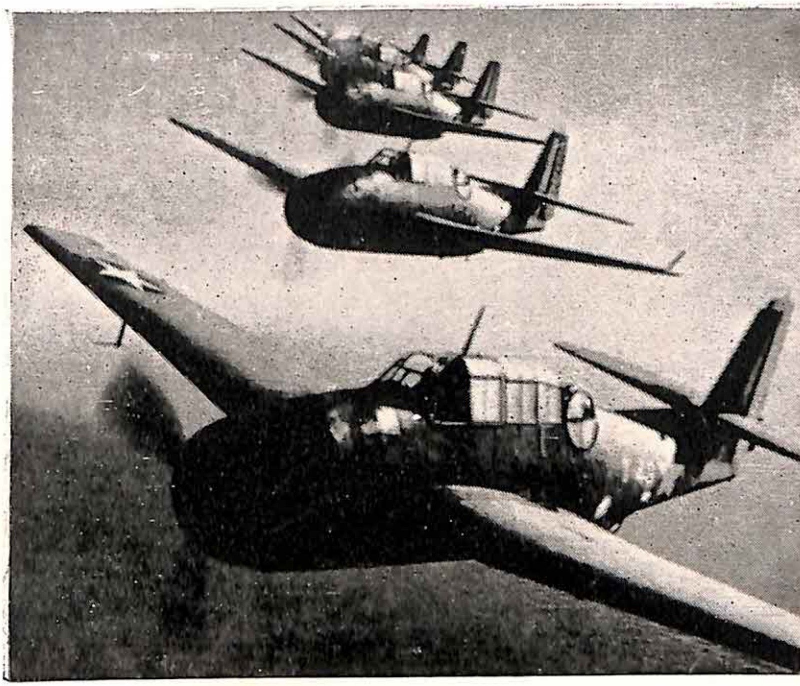
'মিনামাটা ব্যাধি'গ্রস্ত একটি শিশু। সাগরে পারদসংক্রামিত মাছ খেয়ে পারদের বিষক্রিয়ায় জাপানের মিনামাটা দ্বীপপুঞ্জের ১১১ জন মানুষ মারা যায়।
(আমাদের একটিই পৃথিবী আছে)



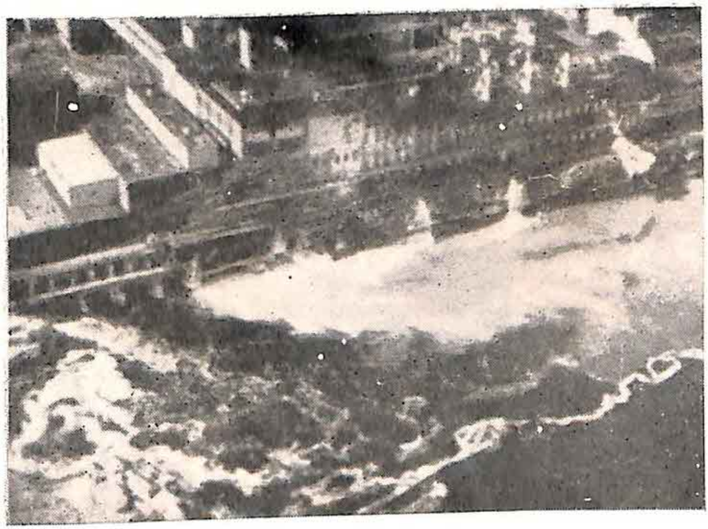
মেরু অঞ্চলের এই ছবিটিতে একই সঙ্গে ধরা পড়েছে আতংক ও সৌন্দর্যের এক মিশ্র রূপ। একদল সীল বরফের খণ্ডগুলোর ওপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। (হিমাবৃত মহাদেশ কুমেরু)।



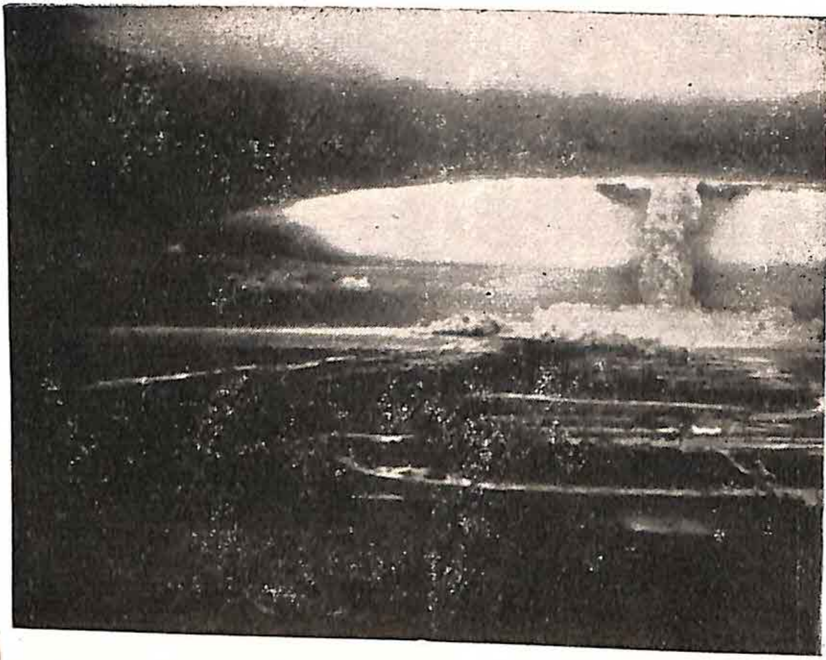
উপকূল থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের উন্মুক্ত বক্ষে তৈরি হবার পর এই তরঙ্গের দল এসে আছড়ে পড়ছে মহাদেশের জমির ওপর। (সাগরের কথা)।



১৯৪৫ সালে অ্যামেরিকার ফ্লোরিডার পূর্ব উপকূলের কাছে এক সাধারণ মহড়া সময় একদল অ্যাভেঞ্জার টরপেডো বোমারু বিমান অদৃশ্য হয়ে গিয়ে বারমুড় ট্র্যাঙ্গলের রহস্যকে ঘনীভূত করে তোলে। (বারমুডা ট্র্যাঙ্গল)।



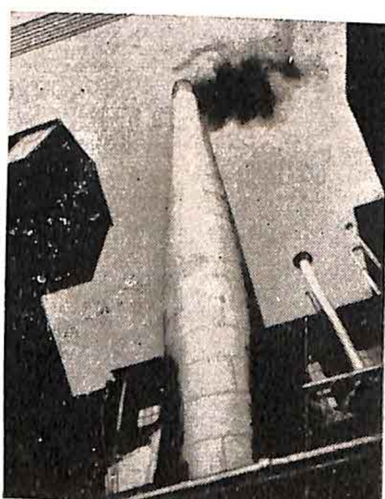
নদীর দু'পাশে কারখানা থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন শিল্পজাত রাসায়নিক উচ্ছিষ্টের দ্বারা নদীর জল দূষিত হচ্ছে। (আমাদের একটিই পৃথিবী আছে)।



১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরের ওপর পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের এই ছবিটি বোমারু বিমান থেকে তোলা হয়। এক লক্ষের মত মানুষ তখনই মারা যায়। তেজস্ক্রিয়তাজনিত ব্যাধিতে এ পর্যন্ত মারা গেছে আরো এক লক্ষের মত মানুষ। (পারমাণবিক মারণাস্ত্র)



"আগুন ও তার ফলে বায়ু দূষণের ব্যাপারটা আবিষ্কার করা গেল হে"।



কারখানার চিমনীর ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে জমা পড়ছে কয়লার মিহি গুঁড়ো এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নানা গ্যাসীয় উপাদান।

(আমাদের একটিই পৃথিবী আছে)

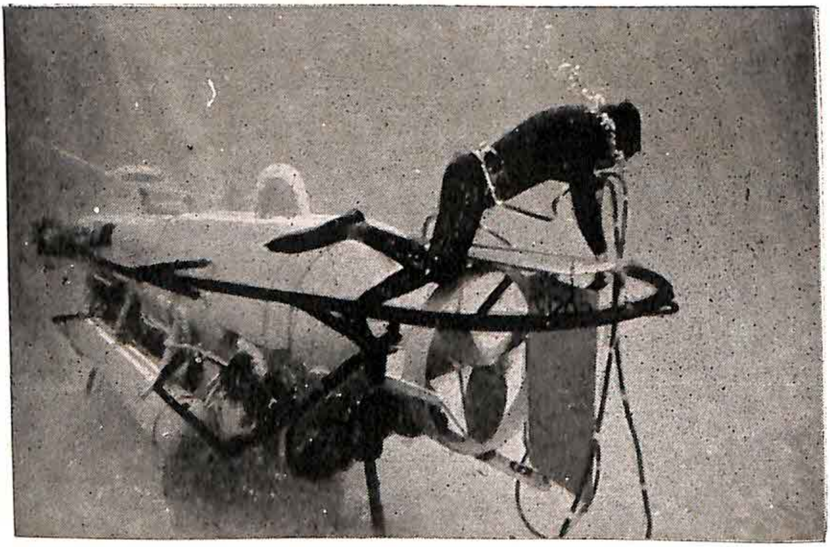


পৃথিবীর নবীনতম পর্বত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টকে (উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার) ছবির মাঝামাঝি জায়গায় একটু ডানদিকে ত্রিভুজাকৃতি রূপে দেখা যাচ্ছে। ওর সামনে নাপৎসে রিজ (উচ্চতা ৭৯০০ মিটার) এবং ডানদিকে হল লোতসে (উচ্চতা ৮৫০০ মিটার)। হিমালয়ের তুষারাবৃত রূপের মহিমায় মানুষের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়েছে যুগে যুগে।

(পৃথিবীর নবীনতম পর্বত)



সামুদ্রিক পরীক্ষামূলক কাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করার পর একটি ডলফিনকে মাছ উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। (সাগরের কথা)।



সাগরের তলদেশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী যান সাবমারসিবল্। ডুবুরীর পোষাক পরে মানুষ যানটির বাইরে বেরিয়ে এসেছে তথ্য সংগ্রহের কাজে। (সাগরের কথা)।

আমাদের নিকটতম নক্ষত্র

আমাদের পরম সৌভাগ্য মহাকাশে আমাদের হাতের কাছে একেবারে তৈরি চমৎকার সুন্দর একটি ল্যাবরেটরিকে আমরা পেয়ে গিয়েছি—নক্ষত্রদের ঘরসংসারের খবরাখবর সংগ্রহের কাজে যে আমাদের বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। পরীক্ষাগারটি হল সূর্য—আমাদের তারাজগৎ ছায়াপথের (মিলাক ওয়ে) দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হল ১৪৮.৮ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের ব্যাস হল ১৩,৯৩০০০ কিলোমিটার—পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯.৩০ গুণ। সূর্যের আয়তনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে তের লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে।

সূর্যকে ঘিরে আমাদের অগণিত প্রশ্ন। সূর্যের জন্ম হল কি ভাবে, সূর্যের তেজভাণ্ডের ভেতরের রহস্যটাই বা কি, সূর্য কি চিরদিন বেঁচে থাকবে, সূর্যের ভবিষ্যৎ কি, সূর্যের মৃত্যু কি আসন্ন ? সূর্য সম্বন্ধে আমাদের এত মাথাব্যথার কারণ হল পৃথিবীর সমস্ত জীব-জগতের অস্তিত্বই ওর ওপরে নির্ভরশীল। সূর্যের আলো এবং তাপকে বাদ দিয়ে আজ থেকে আনুমানিক আড়াইশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর সেই আদি সমুদ্রের জলে প্রথম এককোষী প্রাণসৃষ্টির পরীক্ষাকাজ সম্পূর্ণই হয়ে উঠত না। প্রাণের বিবর্তনের প্রক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে যেত।

এ প্রবন্ধে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার দৃষ্টিতে সূর্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করব।

সূর্যের ভেতরের চেহারাটা

খোলা চোখে নয়, ওয়েলডিং-এর কাজ করার চশমা বা পুরোপুরি কালো দুটি ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে গোল বলের মত ক্ষেত্রটির যে পৃষ্ঠভাগ আমাদের চোখে পড়ে, সে হল ওর আলোকমণ্ডল বা ফোটোসফিয়ার; সূর্যের বায়ুমণ্ডলের এটা হল প্রথম স্তর, এর তাপমাত্রা হল ১১০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এখানে গ্যাসীয় বস্তুর ঘনত্বও খুবই কম। কিন্তু যত সূর্যের অভ্যন্তরে নামা যাবে, তত গ্যাসীয় বস্তুর তাপ ও ঘনত্ব বাড়তে থাকবে। সূর্যের কেন্দ্রের ঘনত্ব হল জলের নব্বই গুণ, লোহার বার গুণ। ওখানে গ্যাসীয় বস্তুও রয়েছে ইস্পাতের মত শক্ত কঠিন অবস্থায়। সূর্যের কেন্দ্রের তাপের পরিমাণ হল আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেন-হাইটের কাছাকাছি।

সূর্যের মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন—পরিমাণে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ; শতকরা ১৫ ভাগ হল হিলিয়াম এবং বাদবাকি অন্যান্য উপাদান। প্রায় ১০০ কোটি হাইড্রোজেন বোমা একসঙ্গে ফাটালে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে, সূর্যের কেন্দ্রের চেহারাটা হল ঠিক তাই। তবে ওখানে সব ব্যাপারটাই রয়েছে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

আলোকমণ্ডলের ওপরে হল সূর্যের বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর বর্ণমণ্ডল বা ক্রোমোসফিয়ার অঞ্চল। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় যে দুটো ঘটনা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে, তাদের একটি হল সৌরোচ্ছ্বাস—বর্ণমণ্ডল অঞ্চল থেকে বিদ্যুতের ঝলকের মত এক একটি গ্যাসের উচ্ছ্বাস হল এরা। এর ফলে তৈরি হয় প্রোটন কণিকার স্রোত, যার আর এক নাম হল সূর্যের বাতাস—এরই কিছু অংশ ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। দ্বিতীয়টি হল সৌরোৎক্ষেপ—আলোকমণ্ডল থেকে হাইড্রোজেন কণিকা ও গ্যাস বিরাট শিখার আকারে লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি ওপরে উঠে আসে।

বর্ণমণ্ডলের ওপরে হল সূর্যের কিরীটিকা বা করোনা অঞ্চল—গ্যাসের এক বিরাট উত্তরীয় বা চাদরের মত যা কোটি কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী পৃথিবীও নাকি এই করোনা প্রভাবিত অঞ্চলেই অবস্থান করছে।

সূর্যের আলোকমণ্ডল থেকে নির্গত বিপুল পরিমাণ আলো ও তাপের দুশো কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। আর তারই ফলে পৃথিবীর জল ও মাটির এলাকা জুড়ে প্রাণের এত বিচিত্র সমারোহ। যে আলো আজ এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এসে পৌঁছল তার বয়েস কিন্তু দশ লক্ষ বছর। সূর্যের কেন্দ্র থেকে আলোরূপী ঐ শক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল গামা ও রঞ্জন রশ্মির আকারে। তারপর সূর্যের কেন্দ্রমণ্ডলের বিপুল চাপযুক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে সূর্যের পৃষ্ঠভাগ পর্যন্ত পৌঁছতেই ওর ওই বিপুল পরিমাণ সময় পার হয়ে বসে আছে। ওর চেহারাটা তখন কিন্তু একেবারেই পালটে গেছে; গামা ও রঞ্জন রশ্মির রূপ দাঁড়িয়েছে অতিবেগুনী, অবলোহিত প্রভৃতি আলোতে। কাজেই যখন সূর্যের টাটকা, তাজা আলোয় গা ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বলে ভাবছি, তখন দশ লক্ষ বছরের পুরনো বাসি আলোটাই কিন্তু গায়ে লাগছে।

পৃথিবীর মাত্র ৩২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যে পরিমাণ সূর্যের আলো এসে পড়ছে, তাকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে তা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর সারা বছরের বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মিটতে পারে। আমাদের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উন্নতির মান আজও কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছয়নি যাতে বিদ্যুৎশক্তি তৈরির এই বিরাট সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

সৌরকলঙ্ক

সূর্যের বুকে মাঝে মাঝে কতগুলো নাটকীয় ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। হঠাৎ দেখা গেল সূর্যের পৃষ্ঠভাগের ওপর কালো কালো ছোপ

ছোপ অনেকগুলো জায়গা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে সৌরকলঙ্ক। আগেকার দিনে মানুষ ভাবত সূর্যকে দানোয় পেয়েছে, আবার কেউ ভাবত সূর্যের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যাচ্ছে। এমনকি স্বয়ং গ্যালিলিও, যিনি পৃথিবীর প্রথম দূরবীণ যন্ত্র তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঐ কালো জায়গাগুলো দেখেছিলেন, তিনিও ভেবেছিলেন ওরা হল সূর্যের বুকে বসানো বিরাট কতগুলো কালো গর্ত। আসল ব্যাপারটা অবশ্য গ্যালিলিওর জানার কথা নয়। বর্তমানে আমরা জানি, ওদের কালো দেখাবার কারণ সূর্যের পৃষ্ঠভাগের (তাপমাত্রা ১১০০০ ডিগ্রি ফারেন-হাইট) তুলনায় ওদের তাপমাত্রা হল ৩০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম। ওরা কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকে না। সূর্যের দেহের ওপর দিয়ে ওরা ঘুরে চলে। প্রতি এগার বছর অন্তর অন্তর ওদের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে উঠতে দেখা যায়। একে বলে সৌরকলঙ্ক চক্র।

একটি বৈজ্ঞানিক মত হল, সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলেই সৌরকলঙ্কদের সৃষ্টি হচ্ছে। এরা যেন সূর্যের বুকে বসানো বিরাট বিরাট পিচকিরির মুখ, যাদের মধ্য দিয়ে সূর্য মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন রশ্মি ও সৌরকণিকা স্রোত। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে এদের সংঘাত সৃষ্টি হবার পর সারা পৃথিবী জুড়ে নানা ধরণের পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র হয়ত দেখা গেল হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠছে। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতারবার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে বসল। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক যে কত নিবিড়, এইসব ঘটনা তারই পরিচয় বহন করছে।

সূর্যের সৃষ্টি

বিজ্ঞানীদের অনুমান. আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে ধূলোকণা এবং হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় কণায় তৈরি বিরাট

বড় বড় মেঘ মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। মেঘেদের মধ্যে ধুলো ও গ্যাসীয় কণাগুলো কিভাবে জড়ো হতে শুরু করেছিল, তার সঠিক ধারণা করা মুসকিল। কারোর মতে আলোর চাপে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়। ধুলো ও গ্যাসীয় কণারা জড়ো হতে হতে যখন বড় একটি পিণ্ডের আকার নিল তখন শুরু হল অভিকর্ষ বলের খেলা। অভিকর্ষের প্রভাবে এরপর থেকে গড়ে ওঠার পালাটা এগিয়ে চলল আরও দ্রুতগতিতে।

এভাবে জড়ো হতে হতে সূর্যের সমপরিমাণ আয়তনের একটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে যখন আমাদের পৃথিবীর প্রায় ৩,৪০,০০০ গুণ বস্তুর সমাবেশ ঘটল, তখন আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড তাপে মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমগ্র বস্তু গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে প্রচণ্ড দীপ্তিশীল একটি নক্ষত্রকে সৃষ্টি করে বসল। এ জাতীয় একটি ঘটনার জন্যে ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপ আড়াই থেকে তিন কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছন দরকার। এত প্রচণ্ড তাপে পদার্থ গ্যাসীয় রূপেও থাকতে পারে না—তার রূপান্তর ঘটে আয়নিত অবস্থায়।

এ জাতীয় একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আজ থেকে আনুমানিক পাঁচশ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের সূর্যের। সৃষ্টিলাভ করেছিল আরও অসংখ্য নক্ষত্র। অসংখ্য কোটি নক্ষত্রদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি তারাজগৎ। আলোর মালায় ভরে উঠেছিল নিকষ কালো মহাকাশের অঙ্গন।

একটি নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বিপুল তাপশক্তির রহস্য জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী হান্‌স্ বেথে প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেন। বেথের মতে তাপ-পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়াই এই তাপশক্তির মূল কারণ। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণুকে সৃষ্টি করছে এবং এই প্রক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে ঘটছে অসংখ্য কোটি পরিমাণে। পদার্থের এই রূপান্তরের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ০.৭ ভাগ পরিমাণ ভর শক্তিতে ভোল পালটে বসছে।

পদার্থের ভরকে যে শক্তিতে রূপ দেওয়া যায় এবং শক্তিকেও রূপান্তরিত করা যায় পদার্থের ভরে, এ কথা মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেছিলেন। আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী সূর্যের কেন্দ্রে ব্যাপারটা কি ঘটছে দেখা যাক। সেখানে নাকি প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেনরূপী গ্যাসীয় বস্তু ৫৬০০ লক্ষ টন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই, সূর্যের দেহ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টনের মত হাইড্রোজেন বস্তু শক্তি বা বিকিরণের আকারে খোয়া যাচ্ছে। আর তার ফলেই না সূর্যের আলো ও তাপের এত জৌলুষ।

অনেকে আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবতে পারেন সূর্য ত ভয়ানক তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, সূর্যের সৃষ্টি যদি আনুমানিক পাঁচশ কোটি বছর আগেও হয়ে থাকে, তাহলে সূর্য এ পর্যন্ত ওর মোট হাইড্রোজেন সঞ্চয়ের শতকরা মাত্র একভাগকে খুইয়েছে। বাদবাকি এখনও মজুত আছে। কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। সূর্য আগামী আরও পাঁচশ কোটি বছর থেকে এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত এক বিপুল পরিমাণ সময় আজকের পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়েই বহালতবিয়তে বেঁচে থাকবে। তারপরের দুর্ভাবনাটা আমাদের নয়, ভাবী বংশধরদের।

সূর্যের জীবনের প্রথম অধ্যায়

আমাদের সূর্য রয়েছে নক্ষত্রজীবনের প্রথম পর্বে, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম হল 'মেন সিকোয়েন্স' বা 'প্রধান পর্যায়'। একটি নক্ষত্রের জন্মলগ্নে যখন ওর ভেতরের পারমাণবিক চুল্লীটা জ্বলে ওঠে, তখন সেখানে দুটি শক্তির খেলা শুরু হয়ে যায়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ বস্তু এক জায়গায় জড়ো হবার ফলে অভিকর্ষ বলকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই বল বাইরের সব বস্তুকে টেনে নামাতে চাইছে

কেন্দ্রের দিকে। কিন্তু এই একমুখী টান বা বলকে প্রতিহত করছে আর একটি উলটোমুখী চাপ, যা নক্ষত্রটির কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কাজ করছে। এই চাপ তৈরি হচ্ছে যে শক্তি থেকে, ওর সৃষ্টি হয়েছিল নক্ষত্রের কেন্দ্রে—পদার্থের ভর শক্তিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে।

এ যেন শুরু হল এক বিরাট দড়ি টানাটানির লড়াই। দুদিক থেকে যুঝতে থাকা দুটো বল বা চাপের জোরটা সমান হলেই মঙ্গল। আমাদের সূর্যের মধ্যে বর্তমানে এ জাতীয় একটি চাপের সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে। এই পর্বে একটি নক্ষত্র থেকে আলো ও তাপের বিকিরণ ঘটে নির্দিষ্ট হারে এবং সেই নক্ষত্রের চারপাশে যদি গ্রহজগৎ সৃষ্টিলাভ করে থাকে তাহলে সেখানে কোন গ্রহে প্রাণসৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে এই পর্বেই। আমরা আগেই আলোচনা করেছি আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে এই শান্তিপর্বের কাল আগামী পাঁচশ কোটি থেকে এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবার সম্ভাবনা।

লোহিত দানব

নক্ষত্র জীবনের দ্বিতীয় পর্ব থেকে অশান্তির পালা শুরু হবে। পাঁচশ কোটি থেকে এক হাজার কোটি বছর পরে আমাদের সূর্যের অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছি। সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পরমাণুদের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হিলিয়ামরূপী ছাইয়ের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই পরিমাণ বাড়তে বাড়তে সূর্যের মোট ভরের শতকরা দশ ভাগের কাছাকাছি যেই এসে পৌঁছবে অমনি অস্থির হয়ে উঠবে সূর্য। এই অবস্থায় সূর্যের কেন্দ্র হঠাৎ সঙ্কুচিত হতে চাইবে এক অস্বাভাবিক পরিমাণে, বাইরেকার সব বস্তুকে আরও দ্রুতবেগে টেনে নামাতে চাইবে ভেতরের দিকে। এ যেন সূর্যের এক উন্মত্ত অবস্থা। এর ফলে অভিকর্ষজনিত স্থৈতিক শক্তি রূপান্তরিত হবে তাপশক্তিতে। সূর্যের কেন্দ্রের তাপ তখন তার স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেড়ে উঠবে বহুগুণ। কেন্দ্রের বর্ধিত তাপে সূর্যের

বাইরের গ্যাসীয় আবরণটা তপ্ত হয়ে প্রসারিত হবে। প্রসারণের ফলে ওর ভেতরকার তাপশক্তি কিছুটা কমবে, ঐ অঞ্চল এখন ছড়াবে লাল আলো, বর্ণালীর অন্য রঙগুলোর তুলনায় তাপের অঙ্কটা যার কম। নক্ষত্রের এ অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে লোহিত দানব বা রেড জায়াণ্ট। মহাকাশে অ্যাণ্টেরেস ও বেতেলগুজে হল এ জাতীয় দুটি নক্ষত্র।

আমাদের সূর্য যখন লোহিত দানব পর্যায়ে পৌঁছবে তখন ওর ক্রমাগত বাড়তে থাকা তপ্ত গ্যাসীয় আবরণটা একে একে গ্রাস করবে সৌরজগতের কাছের চারটি গ্রহকে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। তাপের প্রচণ্ড দহনে পৃথিবীর নদী নালা, সাগর, মহাসাগরের সমগ্র জলরাশি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে আকাশে। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ ঝলসে গিয়ে চেহারাটা দাঁড়াবে বীভৎস ও ক্ষতবিক্ষত, সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ হবে ধ্বংস। অন্য গ্রহগুলোয় কোন প্রাণের অস্তিত্ব এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি! তাই ওদের ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রভাবটা অনুভূত হবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরেই। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলো অনেক দূরে থাকার জন্যে ওদের ক্ষেত্রে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে তুলনামূলকভাবে কম।

সূর্যের কাছ থেকে মৃত্যুর ডঙ্কা যখন বেজে উঠবে তখন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কি করতে পারেন তা নিয়ে কিছু কিছু জল্পনা কল্পনা এখন থেকেই শুরু হয়েছে। জনৈক বিশেষজ্ঞ একটি অভিনব পরিকল্পনার কথা বলছেন। সেই সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নতির কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা আমরা বর্তমানে কল্পনাই করতে পারি না। গোটা পৃথিবীকে একটি মহাকাশযান রূপে ব্যবহার করে সে যুগের বিশেষজ্ঞেরা পৃথিবীকে নিয়ে সৌরজগৎ থেকেই বেরিয়ে যেতে পারেন। পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অর্ধেক জলরাশিকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে সৌরজগৎ থেকে প্রয়োজনীয় নিষ্ক্রমণ-বেগ নাকি অর্জন করা যাবে। পৃথিবীকে নিয়ে সে যুগের বিশেষজ্ঞেরা হয়ত গিয়ে হাজির হবেন এমন এক সৌরজগতে যার কেন্দ্রে নক্ষত্ররূপী

সূর্য এখনও পরিমিত স্বাস্থ্য নিয়ে বজায় রয়েছে, বিরাজ করছে নক্ষত্রজীবনের প্রথম পর্যায়ে।

সূর্যের মৃত্যু

লোহিত দানব পর্যায়ে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনরূপী জ্বালানী একদিন নিঃশেষ হয়ে আসে ; তখন সবটুকু হাইড্রোজেনই হিলিয়ামে রূপ পালটে বসে আছে, পারমাণবিক চুল্লীকে চালু রাখার ইন্ধন এখন নিঃশেষ। নক্ষত্র জীবনের প্রায় অন্তিমপর্বের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি ; নক্ষত্র কুলুজীতে এই পর্বের নাম হল হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন।

আমাদের সূর্য যখন লোহিত দানব পর্যায় থেকে শ্বেত বামন পর্বে প্রবেশ করবে তখন তার আয়তন পূর্বের তুলনায় বহুগুণ ছোট হয়ে পড়লেও ভর কিন্তু থাকবে অপরিবর্তিত। ফলে অভিকর্ষ বল বেড়ে উঠবে এক বিপুল অঙ্কে। পৃথিবীতে একটি মানুষের ওজন যদি হয় ১০০ পাউণ্ড, ওই নক্ষত্রের বুকে সে ওজন দাঁড়াবে হয়ত ২৬২৫ টন। এক ম্যাচবাক্স ভর্তি ঐ নক্ষত্রের বস্তুকে তোলার জন্যে বারটি পালোয়ান ব্যক্তির দরকার হয়ে পড়বে কারণ ওর ওজনই দাঁড়াবে তখন এক টনের কাছাকাছি।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলছেন এত বিপুল ঘনত্ব সত্বেও শ্বেত বামন পর্যায়ে সূর্যের কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত সবটাই হল গ্যাসীয় বস্তু। প্রশ্ন হল, কোন বস্তু গ্যাসরূপেও এত ঘন হয় কি করে? এখানে আসলে পরমাণুগুলো হবে এক বিচিত্র জাতের। ওদের ইলেকট্রনগুলো আর পরমাণুকেন্দ্রকের চারপাশে ঘুরপাক খাবে না বরং কেন্দ্রকের প্রোটন, নিউট্রনদের সঙ্গে গাদাগাদি অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করে নেবে। সোজা কথায়, পরমাণুর ভেতরের ফাঁকা জায়গাটাই বরবাদ হয়ে বসবে। ফলে পরমাণুগুলোর পারমাণবিক ব্যাসও হাজার হাজার গুণ কমে আসে। কক্ষস্থিত ইলেকট্রনদের

হারানর ফলে পরমাণুর ন্যাড়া কেন্দ্রকটির ব্যাস সাধারণ পরমাণুর চেয়ে খুবই ছোট হয়ে দাঁড়ায়—একটি বড় দালানের তুলনায় একটি মাছি যতটা ছোট প্রায় ততটাই। পদার্থের এই অবস্থাকে বলে ওর মৃত বা বিকৃত রূপ। এর পরে বাইরে থেকে সহস্র চাপ প্রয়োগ করেও পদার্থকে আর সংকুচিত বা ঘনীভূত করা যায় না।

শ্বেত বামন পর্যায়ে সূর্যের দেহের তাপও একদিন নিঃশেষ হয়ে আসে কারণ নতুন করে তাপ সৃষ্টির কোন উপাদানই ওর আর নেই। জ্বালানীরূপী হাইড্রোজেন গ্যাসের সঞ্চয় সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে বসে আছে। এবার ধীরে ধীরে ওর গোত্রান্তর ঘটবে কৃষ্ণ বামন রূপে। আকাশের অঙ্গণ থেকে নক্ষত্রের দীপশিখার শেষ চিহ্নটুকু সেদিন বিলীন হয়ে যাবে। কৃষ্ণকায় একটি বস্তুপিণ্ড রূপে নক্ষত্রের মৃতদেহটা আকাশের কোন এক প্রান্তে পড়ে থাকবে। আমাদের সূর্যের বিপুল দেহটা পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের মত ছোট্ট একটি তাপহীন বস্তুতে রূপান্তরিত হবে সেদিন। সমগ্র ঘটনাটা যেন সেক্সপীয়ারের কোন ট্র্যাজেডির বিয়োগান্ত পরিণতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শান্ত সূর্য

অশান্ত সূর্যের প্রকৃতিকে আমরা জানি। সূর্যের চৌম্বক প্রক্রিয়া তখন বেড়ে ওঠে, সৌরকলঙ্ক চক্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ-ভাবে। একই সঙ্গে সূর্যের জোরাল রশ্মি ও কণিকার সংঘাতে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটাও টলমল করতে থাকে। সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ জুড়ে তখন নানা পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়।

শান্ত সূর্য হল সূর্যের এমন একটি পর্যায় যখন সৌরকলঙ্কের সংখ্যা আসে কমে, চৌম্বক প্রক্রিয়ার মাত্রাও থাকে স্তিমিত। শান্ত সূর্যের পর্যায় কখনও কখনও দীর্ঘস্থায়ীও হতে দেখা গেছে। মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, শান্ত সূর্যের পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মির কণিকারা সরাসরি পৃথিবী

পর্যন্ত এসে হাজির হয়। সূর্যের জোরাল চৌম্বক ক্ষেত্র ওর শান্ত পর্যায়ে দুর্বল হয়ে পড়ার জন্যেই ওরা নাকি এভাবে আসতে পারছে। সূর্যদেহজাত প্রোটন কণিকাদের মতই এই রশ্মিকণারা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চুম্বক রশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে বায়ুমণ্ডলের গভীরে নেমে এসে পৃথিবীর জমি থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওজোন স্তরটার ক্ষতিসাধন করে। এই ওজোন গ্যাসের স্তরটি সূর্য-দেহজাত অতিবেগুনী রশ্মির মারাত্মক সংঘাতের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাজাগতিক রশ্মির আক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যে পৃথিবীর যে স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শান্ত পর্যায়ে তা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ তথ্যটা যে মোটেই আনন্দদায়ক নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সূর্যকে নিয়ে সমস্যা

সূর্যকে নিয়ে এক মস্ত সমস্যায় পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। হাইড্রোজেন পরমাণুরা মিলে সূর্যের কেন্দ্রে গড়ে তুলছে হিলিয়াম পরমাণুদের—যে প্রক্রিয়ার সময় পদার্থের ভর রূপান্তরিত হচ্ছে শক্তিতে। এই সৃষ্টি-শক্তির একটি পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রিনো বস্তুকণাদের তৈরি হবার কথা। নিউট্রিনো হল এক বিচিত্র জাতের বস্তুকণা যার না আছে কোন বৈদ্যুতিক চার্জ এবং স্থৈতিক ভর (রেস্ট মাস) যার হল শূন্যের কোঠায়। ১৯৬৮ সালে অ্যামেরিকার ব্রুকহ্যাভেন জাতীয় গবেষণাগারে বিজ্ঞানী রেমণ্ড ডেভিস ও তাঁর সহকর্মীরা নিউট্রিনোকে ধরার এক আদর্শ খাঁচা তৈরি করলেন এবং প্রায় এক দশক ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা কাজ চালান হল। কিন্তু সূর্য থেকে পৃথিবীতে নিউট্রিনো আসছে তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। নিউট্রিনোরা তাহলে গেল কোথায়? এ থেকে কি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে সূর্যের ভেতর শক্তি সৃষ্টির আসল ব্যাপারটাই আমরা এখনও ভালভাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

প্রশ্ন উঠল, সূর্যের কেন্দ্রে নিউট্রিনোরা হয়ত আদৌ তৈরিই হচ্ছে না। যদি তাই শেষ পর্যন্ত মানতে হয়, তাহলে সিদ্ধান্তটা দাঁড়াবে এই যে সূর্য তার তাপ-পারমাণবিক কারখানাটির ঝাঁপ পুরোপুরি ভাবেই বন্ধ করে বসে আছে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কিছু বিশেষজ্ঞ কোনদিক থেকে আলোর সন্ধান না পেয়ে প্রায় মরীয়া হয়ে এরকম একটি কথা বলে বসলেন। এটা সত্যি হলে ঘটনাটা দাঁড়াবে এই—সূর্য আগামী কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে তার তাপের জৌলুষ হারিয়ে ম্লান হয়ে আসবে। সূর্যের তাপ কমে আসার ফলে গোটা পৃথিবী জুড়ে ঘনিয়ে উঠবে এক তুষার যুগ।

একদল বিজ্ঞানী এক ভারী বিচিত্র কথা বলে বসলেন—সূর্যের কেন্দ্রের মধ্যেই হয়ত একটি ক্ষুদে কৃষ্ণ গহ্বর রয়েছে, যে বস্তুটি তার জোরাল অভিকর্ষের টানে নিউট্রিনোদের বেমালুম গ্রাস করে নিচ্ছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ গহ্বরেরা হল এক বিচিত্র বস্তু। বিজ্ঞানীরা এদের নক্ষত্রই বলছেন কিন্তু এরা হল কৃষ্ণবর্ণ, এদের চোখে দেখা যায় না। এক বিপুল ঘনত্বের অধিকারী হল এরা, যার ফলে এদের অভিকর্ষ-বল এমন এক অসীম অংকে পৌঁছে বসে আছে যে এরা এদের দেহ থেকে আলো এবং বেতার তরঙ্গকেও নির্গত হতে দিচ্ছে না, অভিকর্ষের টানে ওদের বন্দী করে ফেলছে।

সূর্যকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা সত্যিই এক গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েছেন। সূর্য থেকে হারিয়ে যাওয়া নিউট্রিনোদের সমস্যা এখনও সঠিক আলোকপাতের জন্যে অপেক্ষা করছে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে।

সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব

নক্ষত্রের অন্তঃপুরের রহস্য উদঘাটনের আগ্রহ মানুষের বহুদিনের। নক্ষত্রের বর্ণালী নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৫৯ সাল থেকেই। এ সন্ধান কাজে হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল কোয়ান্টাম

বলবিদ্যা, যার সূত্রাবলীকে ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাই সর্বপ্রথম নক্ষত্রের বর্ণালীর রেখাচিত্রের রহস্য উদঘাটনের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর তাপ-আয়নন তত্ত্বে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন বলেছিলেন, ১৬১০ সালে গ্যালিলিওর দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি আবিষ্কারের মধ্যে সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব হল একটি। আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার সূত্রপাত হয়েছিল এই তত্ত্ব থেকেই। এই তত্ত্বের সাহায্যে অন্য নক্ষত্রদের মত সূর্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জনের একটি মস্ত বড় হাতিয়ার পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

সাহা বললেন, আমরা জানি ক্রমবর্ধমান তাপের প্রভাবে একটি পদার্থের অবস্থার ক্রমেই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থা, তারপর গ্যাসীয় রূপ—তাপের প্রভাবে গ্যাসীয় অণুরা প্রথমে ভেঙ্গে যায় সরল যৌগ পদার্থে, তারপর যৌগ পদার্থ থেকে মৌলিক পদার্থদের অণুরা ভেঙ্গে গিয়ে জোড়বদ্ধ পরমাণুদের মুক্তি দেয়। তাপের পরিমাণ যতই বেড়ে চলে, পরমাণুদের ঘর সংসারও আর অক্ষুণ্ণ থাকে না-ওদের বাইরের কক্ষপথ থেকে কিছু ইলেকট্রন খোয়া যেতে শুরু করে। সাহা বললেন, নক্ষত্রদের বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ তাপের পরিবেশে বহু পরমাণুই ওদের বাইরের কক্ষস্থিত ইলেকট্রনদের হারিয়ে খণ্ডিত চেহারা অর্জন করে বসবে। পরমাণুদের এই খণ্ডিত রূপের গঠনপ্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে আয়নিতকরণ এবং খণ্ডিত পরমাণুটিকে বলা হচ্ছে আয়ন। যে কোন একটি নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডল জুড়ে তাই রয়েছে এক গ্যাসীয় মিশ্রণ, যার উপাদানেরা হল মুক্ত ইলেকট্রন, খণ্ডিত, অখণ্ডিত বা গোটা পরমাণু।

সাহা এবারে এই গ্যাসীয় মিশ্রণের ক্ষেত্রে গ্যাসের কাইনেটিক বা গতীয় তত্ত্ব ও তাপীয় গতিবিদ্যার সূত্রগুলোকে প্রয়োগ করে সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। সাহার সমীকরণের মাধ্যমে সূর্যরূপী একটি নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলে সর্বপ্রথম আয়নিতকরণের মাত্রার পরিমাপ করা সম্ভবপর হল।

১৯৩৫ সালের ১১ জানুয়ারি লণ্ডনে রয়্যাল অ্যাসট্রোনমিকাল সোসাইটির দপ্তরে একটি সভা ডাকা হয়েছে। এই সভায় ২৪ বছর বয়স্ক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম্ চন্দ্রশেখর এক গবেষণাপত্র পেশ করবেন। চন্দ্রশেখর কয়েক বছর ধরে নক্ষত্রদের গঠনতত্ত্ব নিয়ে গবেষণাকাজ এবং মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু আঙ্কিক সূত্র প্রণয়নের চেষ্টা করছিলেন।

চন্দ্রশেখরের গবেষণা পত্রটি একটি মৌলিক প্রশ্নকে তুলে ধরেছিল। একটি নক্ষত্র তার সমস্ত জ্বালানীকে পুড়িয়ে ফেলার পর কি হবে? প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নক্ষত্রটি ওর অভিকর্ষ-বলের প্রভাবে কেন্দ্রের দিকে ধসে পড়বে এবং একটি অতি ঘনত্বযুক্ত শ্বেত বামনরূপী নক্ষত্রে রূপান্তরিত হবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে সূর্যের সমান ভরবিশিষ্ট একটি নক্ষত্রের পরিণতি ঘটবে পৃথিবী অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র আয়তনের একটি বস্তুতে।

চন্দ্রশেখর বললেন যে সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ বেশি ভরবিশিষ্ট একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে অভিকর্ষ-বল এত বিপুল পরিমাণে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে যে শ্বেত বামন পর্যায়ের পরেও নক্ষত্রটির কেন্দ্রের দিকে ধসে পড়ার পালা শেষ হবে না। নক্ষত্রটি ক্রমেই আকারে ছোট থেকে আরও ছোট, ঘন থেকে আরও ঘনীভূত হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটাই ছিল সবচেয়ে রোমাঞ্চকর একটি প্রশ্ন। চন্দ্রশেখর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই প্রশ্নটির উত্তর অসমাপ্ত রেখেছিলেন।

চন্দ্রশেখরের বক্তব্য শেষ হবার পর তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুরধার জ্যোতির্বিদ এডিংটনের বলার পালা শুরু হল। তিনি চন্দ্রশেখরের সমস্ত বক্তব্যটিকেই নস্যাৎ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। তাঁর মতে চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে নক্ষত্রটিকে ক্রমাগতই বিকিরণ ঘটাতে হবে এবং অভিকর্ষের প্রভাবে সঙ্কুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত

ওর ব্যাস দাঁড়াবে কয়েক কিলোমিটার মাত্র। এ অবস্থায় অভিকর্ষ-বল এত জোরাল হবে যে নক্ষত্রটির দেহ থেকে আর কোন বিকিরণই ঘটবে না। নক্ষত্রটির জীবনে এরপর হয়ত নেমে আসবে এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পর্ব।

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি এ জাতীয় একটি বস্তুকে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর (ব্ল্যাক হোল)। ঐ সভায় এডিংটন বলেছিলেন এ জাতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব আদৌ হয়ত সম্ভবপরই নয়। ছোটবড় যে কোন ভরবিশিষ্ট নক্ষত্রেরই শেষ পর্যন্ত পরিণতি ঘটবে শ্বেত বামন পর্যায়ে।

এডিংটনের প্রতিষ্ঠার দাপটে চন্দ্রশেখরের বক্তব্য কয়েক দশকের মত ধামাচাপা পড়েছিল। অবশেষে সেই তত্ত্ব একদিন প্রমাণিত হয়েছিল অভ্রান্ত সত্যরূপে। কৃষ্ণ গহ্বরের ধারণা আজ জ্যোতির্পদার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সূর্যের তুলনায় ১.৪ গুণ ভরবিশিষ্ট নাক্ষত্রিক ভর বিজ্ঞানজগতে 'চন্দ্রশেখরের মাত্রা' নামে পরিচিত।

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে নক্ষত্রজীবনের এক বিচিত্র রহস্য উন্মোচনে চন্দ্রশেখর যে সত্যদ্রষ্টার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এডিংটনের মত শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী যার গুরুত্ব সেদিন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন—সেই সমগ্র ব্যাপারটাই বিজ্ঞানজগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যে চন্দ্রশেখরকে ১৯৮৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ

এই বিরাট মহাবিশ্বের বুকে আমাদের সৌরজগৎ হল একটি ছোট্ট টুকরো ধুলোকণার মত। সৌরজগতের নটি গ্রহের মধ্যে আমাদের পৃথিবী হল একমাত্র গ্রহ যেখানে মানুষের মত এক জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণব্যবস্থার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। এই মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট সভ্যতা।

এই মহাবিশ্বে আমরাই কি একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী? আমাদের সমপর্যায়ের সভ্যতা কি আর কোথাও নেই? এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন আমাদের মত বুদ্ধিমান মানুষ এবং সেই মানুষের হাতে গড়া হয়ত আমাদের চেয়েও বহুগুণে উন্নত সভ্যতা এই মহাবিশ্বে রয়েছে আরও অসংখ্য পরিমাণে। এদের কারুর সঙ্গেই আজও পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ওদের খোঁজার জন্যে বিজ্ঞানীদের সন্ধান কাজ কিন্তু চলেছে অবিশ্রান্তভাবে।

আমরা বাস করি ছায়াপথ নামে একটি বিশ্বে বা তারাজগতে, যা গড়ে উঠেছে ১০,০০০ কোটি তারার সমবায়ে। এই বিপুল সংখ্যক তারার মাঝে আমাদের সূর্যের পরিচয় খুবই নগণ্য। আয়তনের বিচারে এবং উজ্জ্বলতার মাপে সূর্যের চেয়ে বড় তারার সংখ্যা ছায়াপথের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য।

বিরাট এ মহাবিশ্ব

আমাদের বিশ্বের ব্যাস হল এক লক্ষ আলোক-বর্ষ। আলোর বেগ হল সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল। আমাদের সৌরজগৎ রয়েছে

ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে ৩৩০০০ আলোক-বর্ষ দূরে, আমরা হলাম ওর শহরতলীর বাসিন্দা। সূর্যকে বাদ দিয়ে আমাদের সবচেয়ে ঘরের কাছের তারাটি হল প্রক্সিমা সেণ্টরি, আমাদের সৌরজগৎ থেকে যার দূরত্ব হল ৪.৩ আলোক-বর্ষ।

আলোক ও বেতার দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে চলেছেন আমাদের বিশ্বকে এবং আরও অগুণতি বিশ্বকে। আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী তারাজগৎটির নাম হল অ্যাণ্ড্রোমিডা। আমাদের ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব হল কুড়ি লক্ষ আলোক-বর্ষ। এর মধ্যেও রয়েছে ১০০০০ কোটি তারা এবং আয়তনে এ প্রায় আমাদের ছায়াপথেরই মত।

মহাবিশ্ব কি অসীম, অনন্ত ?

এ পর্যন্ত প্রায় দশ কোটি তারাজগৎ ধরা দিয়েছে আমাদের আলোক ও বেতার দূরবীন যন্ত্রগুলোর নাগালের মধ্যে। এর বাইরেও রয়েছে আরও অসংখ্য কোটি তারাজগৎ। অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত মানের বেতার দূরবীনের সাহায্যে এমন একটি তারাজগতের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি, যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতেই নাকি সময় লাগে প্রায় ১২৪০ কোটি বছর। অর্থাৎ কি না, ঐ বেতার তরঙ্গ যাত্রা শুরু করেছিল সেই তারাজগৎ থেকে এমন একটি সময়ে, যখন পৃথিবী ও সৌরজগতের আদৌ সৃষ্টিই হয়নি।

মহাবিশ্বের সীমা কি তাহলে ১২৪০ কোটি আলোক-বর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? বিজ্ঞানীদের মতে এ হল আমাদের দৃশ্যগোচর বিশ্বের সীমানা। এর বাইরেও রয়েছে অসংখ্য কোটি তারাজগৎ। যত উন্নত মানের দূরবীন যন্ত্র তৈরি হতে থাকবে, তত আমাদের কাছে এই মহাবিশ্বের সীমানা বিস্তৃততর হয়ে চলবে।

মহাবিশ্ব কি তাহলে অসীম, অনন্ত। এই প্রশ্নের জবাব মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রথমে কিভাবে দিয়েছিলেন, দেখা যাক। তাঁর জবাবটা ছিল—এই মহাবিশ্ব হল অসীম, কিন্তু অনন্ত নয়।

অসীম মানে একটি বায়ুপূর্ণ বেলুনের মত—যার কোন সীমা নেই, কিন্তু ও কোন অনন্ত ক্ষেত্র নয়। কোন কিছুকে যখনই আমরা বলছি অনন্ত তখনই ও আমাদের বিজ্ঞানের সব নিয়মের বাইরে চলে যাচ্ছে, কোন সূত্র দিয়ে ওকে বেধে ফেলার আর উপায় থাকছে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ সেখানে খেই হারিয়ে ফেলছে।

পরে যখন দেখা গেল, এই মহাবিশ্ব ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং তার সীমার কোন পরিমাপ করা যাচ্ছে না, আইনস্টাইন তখন বলেছিলেন, এই মহাবিশ্ব হয়তো সত্যিই অসীম এবং অনন্ত।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে হল, কীভাবে এর বিবর্তন ঘটছে, এর ভবিষ্যৎই বা কী, এই মহাবিশ্ব কি অসীম ও অনন্ত—এই বিরাট প্রশ্নগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। কোন বিষয়েই কিন্তু আজও শেষ কথাটা জানা সম্ভবপর হয়নি।

প্রাণ সৃষ্টির মূলে

আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টির পেছনে বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়েছেন। যেমন, গ্রহগুলোর সূর্য পরিক্রমা-পথের চেহারাটা হল উপবৃত্তাকার। গ্রহগুলো প্রায় সবাই ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, তার ঠিক উলটো দিকে সূর্যকে পরিক্রমা করে চলেছে। গ্রহগুলোর সূর্য পরিক্রমা-পথ সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই তলে রয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহ যেন একটি বিশাল থালার মত সমতল ক্ষেত্রের ওপর বসান। সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্বকে একটি অঙ্কের সূত্রের মধ্যে মোটামুটিভাবে বেঁধে ফেলা যায়।

গ্রহগুলোকে আবার দুটো নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যাচ্ছে। একটি হল পৃথিবী জাতের গ্রহ; এরা সংখ্যায় চারটি—বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল। অপরটি হল বৃহস্পতি জাতের বিশাল চেহারার গ্রহ; এরাও সংখ্যায় চারটি—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। প্লুটো অবশ্য এই দুই শ্রেণীর কোন একটিতেও পড়ে না—ও যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জগৎ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রহদের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর গ্রহদের গড়পড়তা ঘনত্ব অনেক বেশি। কারণ, দ্বিতীয় শ্রেণী বা বৃহস্পতি জাতের গ্রহেরা মূলত গ্যাসীয় উপাদানে ভরা এবং পৃথিবী জাতের গ্রহদের গঠনে কঠিন শিলার আধিক্য বেশি। রাসায়নিক উপাদানের বিচারে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের মধ্যে একটি অভিন্নতার সূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে এই নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে গ্রহজগতের সৃষ্টি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রসূত নয়। বরং বিভিন্ন গ্রহ এবং ওদের চাঁদগুলো একই পরিবারের সদস্যরূপে, একই সময়ে এবং একই জায়গাতে একটি বিরাট ধুলো এবং গ্যাসের মেঘের মধ্যে ঘনীভবন এবং দানা পাকাবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিন সৃষ্টিলাভ করেছিল। বিজ্ঞানীদের অভিমত হল এই, আমাদের সৌরজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো সূর্যের মত অন্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রে পালিত হলে সেখানেও গ্রহজগতের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

যে কোন সৌরজগতের যে কোন একটি গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের জন্যে কতকগুলো বিশেষ পরিস্থিতি বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পৃথিবীতে যে ব্যাপারটা ঘটতে দেখা যাচ্ছে সে পরিস্থিতিগুলোর সঙ্গে এবারে আমরা পরিচিত হব।

একটি গ্রহ যে সৌরজগতের বাসিন্দা, তার নক্ষত্ররূপী সূর্যের খুব কাছে যদি ও থাকে তাহলে প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেখানে কোন জটিল প্রাণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর নয়। বুধ গ্রহের ক্ষেত্রে এ জাতীয় একটি ব্যাপার ঘটছে। ওর পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা ৬৫০ ডিগ্রি ফারেন-হাইটের কোঠায় পৌঁছে যায়। তাই বুধে কোন প্রাণীজগৎ গড়ে উঠতে পারেনি, যেমন গড়ে উঠতে পারেনি সূর্যের আর একটি কাছের গ্রহ শুক্রের বুকে। সূর্যের তাপে তপ্ত শুক্রের জমি থেকে নিঃসৃত তাপ তরঙ্গ ওর বায়ুমণ্ডলে ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ঘেরা-টোপের তলায় বন্দী হয়ে গ্রহটির জমির তাপমাত্রাকে প্রায় ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কোঠায় পৌঁছে দিয়ে বসে আছে।

আবার সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পরিবেশে

কোন জটিল প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটেছে বিশাল আকারের গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের ক্ষেত্রে, যাদের পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা হল যথাক্রমে −২২০, −২৪০, −৩০০ ও −৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, যা হল কিনা হিমাঙ্কেরও অনেক নিচে।

গ্রহটির সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকবে একটিমাত্র তারা, যুগল তারা নয়। যদি যুগল তারা থাকে, তাহলে দুটি তারা থেকে আলো এবং তাপের ঢেউ সমপরিমাণে বা নির্দিষ্ট হারে গ্রহটিতে এসে পৌঁছবে না। কখনও তার মাত্রা যাবে কমে, আবার কখনও তা খুব বেড়ে উঠবে। সদা পরিবর্তনশীল তাপের একটি পরিবেশ জটিল প্রাণসৃষ্টির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

একটি নক্ষত্রের কোন গ্রহে প্রাণ সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্যে নক্ষত্রটি থেকে বিকিরণের পরিমাণ কয়েকশ কোটি বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা দরকার। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গত কয়েকশ কোটি বছরে সূর্যের উজ্জ্বলতার মাপ যেটুকু পরিবর্তিত হয়েছে, তার পরিমাণ শতকরা একভাগের কয়েক দশকের মত। সূর্য আরো আগামী পাঁচশ কোটি বছর পর্যন্ত তার এই স্থিতাবস্থাশীল অবস্থাতেই থাকবে, তাই আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মত কোন কারণ নেই।

কোন একটি গ্রহে প্রাণ সৃষ্টির মূলে গ্রহটির ভর এবং ওর বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বুধের ভর খুবই কম, সে অনুপাতে গ্রহটির অভিকর্ষ-বলের পরিমাণও কম। ফলে ও তার বায়ুমণ্ডল এবং পৃষ্ঠভাগের জলকে ধরে রাখতে পারেনি। পৃথিবীর চাঁদের ক্ষেত্রেও ঠিক এ জাতীয় একটি ব্যাপার ঘটেছে।

বৃহস্পতি বা শনির মত বিশাল আকারের গ্রহ জোরাল অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নিজেদের বায়ুমণ্ডলে সমস্ত গ্যাসীয় উপাদান এমনকি হাইড্রোজেনের মত খুব হালকা গ্যাসকেও ওদের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে

যেতে দেয় নি। ঐ গ্যাসটি কার্বন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিথেন ও অ্যামোনিয়ার মত কতগুলো গ্যাস তৈরি করে তুলেছে, কোন গ্রহে উন্নত জীবের বিকাশের পক্ষে যাদের অবস্থিতি খুবই ক্ষতিকারক।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কোন অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প নেই, তা সম্পূর্ণভাবেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে তৈরি। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলেও রয়েছে প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। একমাত্র পৃথিবীতেই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ গড়ে উঠতে পেরেছে, উন্নত প্রাণীর সৃষ্টি ও বিকাশের জন্যে যে গ্যাসটির প্রয়োজন খুবই বেশি।

পৃথিবী জুড়ে নিয়মের রাজত্ব

একটি গ্রহে প্রাণসৃষ্টির প্রতিটি প্রয়োজনীয় শর্তকে আমাদের পৃথিবী অতি সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছিল স্বল্প কিছুকাল ধরে নয়, বহু কোটি বছর ধরে। আর তারই ফলে এখানে উন্নত শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্ভব হতে পেরেছিল। জটিল প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর একটিকেও আমরা সৌরজগতের অন্য গ্রহদের ক্ষেত্রে পালিত হতে দেখি না।

পৃথিবীর বয়স যদি হয় ৪৫০ কোটি বছর এবং পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি যদি আজ থেকে আনুমানিক ২৫০ কোটি থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে হয়ে থাকে, বিবর্তনের ধারাপর্যায়ে যার এক বিচিত্র প্রকাশ আজ আমরা পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে যে কোন সৌরজগতের যে কোন একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশের অনুকূল একই পরিবেশ এবং ঘটনাবলী পুনরাবৃত্ত হলে তার পরিণতি হবে একই —প্রাণের এক বিচিত্র সমারোহে ভরে উঠবে গ্রহটির জল, মাটি ও আকাশ। বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মেই তা ঘটবে এবং এই নিয়মের একমাত্র লীলাক্ষেত্র হল আমাদের এই পৃথিবী, বিজ্ঞানীরা আদৌ তা মনে করেন না। এ জাতীয় গ্রহজগৎ আমাদের মহাবিশ্বে কতগুলো

থাকতে পারে তার সংখ্যার হিসাব নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক রয়েছে।

জ্যোতির্বিদ হার্লো স্যাপলির মতে আমাদের ছায়াপথের শতকরা অন্তত এক থেকে দুভাগ তারার ক্ষেত্রে গ্রহজগৎ রয়েছে। তাহলে ১০০০০ কোটি তারার মধ্যে গ্রহজগতের অধিকারী তারার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০০ কোটি। এই ১০০ কোটি তারার গড়ে যদি পাঁচটির মত গ্রহ থাকে, তাহলে ছায়াপথে মোট গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০০ কোটির মত। এই ৫০০ কোটি গ্রহের মধ্যে অন্তত ৫০ কোটি গ্রহে প্রাণসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। এদের মধ্যে আবার অন্তত দশ লক্ষ গ্রহে মানুষের মত জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে বলে স্যাপলি ও অন্য বিজ্ঞানীদের অনুমান। অর্থাৎ, এই ১০ লক্ষের বেশির ভাগ গ্রহেই মানুষের কাছাকাছি বা হয়ত মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণীর সভ্যতা বর্তমান। আমাদের বিশ্ব এবং এরকম আরো অসংখ্য কোটি বিশ্বকে নিয়ে যে মহাবিশ্ব, সেখানে এরকম উচ্চস্তরের সভ্যতার সন্ধান আমরা যে আরও কত পেতে পারি, তার সীমাসংখ্যা নেই।

তারাজগতে গ্রহের সন্ধানে

প্রশ্ন উঠতে পারে, দূরবীন যন্ত্রের নাগালের মধ্যে কোন একটি তারার চারপাশে যে গ্রহজগৎ রয়েছে তা জানার উপায় কী? এটা সম্ভবপর হতে পারে একমাত্র তারাটির কৌণিক ভরবেগের পরিমাপের মধ্য দিয়েই। কোন বস্তুর ভরবেগ বা মোমেন্টাম হল বস্তুটির ভর ও বেগের গুণফল। লাটিমের মত পাক খেতে থাকা একটি বস্তুর কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ তাহলে দাঁড়াবে বস্তুটির ভরবেগ ও যে কেন্দ্রের চারপাশে ও ঘুরপাক খাচ্ছে, সেখান থেকে ওর দূরত্বের গুণফল।

মনে করা যাক, সুদূর কোন সৌরজগতের কোন বুদ্ধিমান জীব আমাদের সৌরজগৎকে পর্যবেক্ষণ করছে। ওর দূরবীন যন্ত্রে আমাদের গ্রহগুলো ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সূর্যের কৌণিক ভরবেগ

মাপতে গিয়ে সে অবাক হয়ে দেখল, সেটা যা হওয়া উচিত, সে তুলনায় দেখাচ্ছে শতকরা মাত্র দুভাগ। বাদবাকি শতকরা ৯৮ ভাগ তাহলে গেল কোথায়? সুদূর গ্রহবাসী ঐ প্রাণীটি যদি বিজ্ঞানী হন তাহলে তাঁর বুঝতে কোন বিলম্ব হবে না যে বাকি ভরবেগটা গ্রাস করেছে তারাটির গ্রহের দল।

কৌণিক ভরবেগের পরিমাপ করে সূর্যের ১০ থেকে ২২ আলোক-বর্ষ দূরত্বের মধ্যে গোটা কুড়ি তারার চারপাশে বিজ্ঞানীরা গ্রহজগতের অস্তিত্বকে অনুমান করছেন। এরকম কয়েকটি তারার নাম হল এপসাইলন এরিদানি, টাউ সেটি, অপহিউসি, সিগমা ড্রাকোনিস প্রভৃতি। আমাদের কাছ থেকে এদের দূরত্ব হল যথাক্রমে ১০.৮, ১১.২, ১৭.৩ ও ২৬.৩ আলোক-বর্ষ। এদেরই কিছু গ্রহে জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব ও বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে বসে আছে বলে অনুমান করা হচ্ছিল।

১৯৫৬ সালে অ্যামেরিকার স্প্রুল মানমন্দির থেকে তোলা আমাদের দ্বিতীয় নিকটতম নক্ষত্র ছয় আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত বার্নার্ড স্টার-এর ছবি থেকে ওর একটি সঙ্গীর সন্ধান পাওয়া গেল। বার্নার্ড নক্ষত্রটি নিজেই আকারে খুব ছোট। ওর সঙ্গীটির বেলায় দেখা গেল ওর ভর বৃহস্পতির ভরের মাত্র দেড় গুণ। এ জাতীয় একটি বস্তুকে গ্রহ ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

সুদূর গ্রহলোকের বাসিন্দা

আমাদের কাছে বা দূরে অন্য সৌরজগতে যদি বুদ্ধিমান প্রাণীদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে ওদের চেহারা কীরকম হতে পারে এ নিয়ে নানারকম অনুমান রয়েছে। পৃথিবীতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলযুক্ত এবং প্রাণধারণের অনুকূল অন্য যে সব প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্তমান, ঠিক সেই একই পরিবেশ রয়েছে যে সব গ্রহে, সেখানে বিবর্তনের ক্রমবিকাশে মানুষেরই মত প্রাণীদের বসবাস করবার কথা।

পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের একটি মাত্র ধারার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, তা হল কার্বনভিত্তিক। আমাদের জীবদেহের মূল উপাদান হল কার্বন। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সমবায়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় জটিল যৌগিক পদার্থ গড়ার ক্ষমতা একমাত্র কার্বনেরই আছে। কিন্তু কোন গ্রহের বিচিত্র এক প্রাকৃতিক পরিবেশে মৌলিক পদার্থ সিলিকন, গন্ধক বা ফসফরাসকে ভিত্তি করেও ত জটিল প্রাণীদেহ গড়ে উঠতে পারে। বিবর্তনের নানা ধরনের বিচিত্র পরীক্ষা অন্য গ্রহজগতে ঘটতে কোন বাধাই নেই।

যে সব গ্রহের ভর পৃথিবীর তুলনায় বেশি, সেখানে বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে থাকলে তাদের চেহারা হবে গোল বলের মত বা চ্যাপটা আকারের। গ্রহটির জোরাল অভিকর্ষের টান সামলাবার জন্যেই তাদের এ জাতীয় দৈহিক গঠন গড়ে উঠেছে।

কোন গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেদের পক্ষে অক্সিজেন হয়ত বিষ, তারা বাস করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া বা মিথেন গ্যাসে পূর্ণ একটি বায়ুমণ্ডলে, আমাদের জীবদেহের পক্ষে যা হল মারাত্মক। তাদের দেহযন্ত্রও সেই পরিবেশ অনুযায়ীই গড়ে উঠবে।

কোন গ্রহ হয়ত তার সূর্যের কাছ থেকে আমাদের তুলনায় কিছু বেশি পরিমাণে তাপ পাচ্ছে। সেখানে কোন বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে থাকলে তাদের দেহযন্ত্র অতিরিক্ত তাপধারণের উপযোগীরূপেই গড়ে উঠবে।

সবচেয়ে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি হবে সেই সব গ্রহে যাদের ভর কোন কারণে কমে যাওয়ার দরুণ অভিকর্ষ-বলের জোরটাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। ঐ সব গ্রহ ওদের বায়ুমণ্ডলকে বরাবরের মত ধরে রাখতে পারবে না। সেখানে কোন বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে থাকলে শ্বাসবায়ুর অভাবে একদিন মৃত্যু তাদের অবধারিত। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে আসার ফলে ওদের জীবদেহ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলবে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে কোনরকমভাবে

খাপ খাইয়ে টিকে থাকার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও একদিন তার সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হবে।

মহাবিশ্বে আমরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী এ অহমিকার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মহাবিশ্বে বয়সের বিচারে আমাদের সূর্য এক নবীন তারা। সূর্যের চেয়ে বয়সে প্রাচীন অসংখ্য তারা রয়েছে। সেই তারাদের গ্রহজগতের কোথাও যদি বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকে, স্বভাবতই ওরা হবে আমাদের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত। বুদ্ধিবৃত্তির মাপে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমৃদ্ধির বিচারে ওরা হয়ত আমাদের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে রয়েছে। ওদের শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক চেতনাবোধও হয়ত এক অসাধারণ উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছে বসে আছে।

সবাই মিলে খুঁজে চলেছি

মনে করা যাক, এই বিশ্বে কোন একটি গ্রহে অত্যন্ত উন্নত ধরনের এক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যে সভ্যতার স্রষ্টারা নিজেদের অস্তিত্বকে অন্যান্য গ্রহের উন্নত সভ্যতার কাছে প্রকাশ করতে চান। যোগাযোগের মাধ্যমরূপে তাদের সাহায্য নিতে হবে বেতার তরঙ্গের। সুবিধাটা হল, বেতার তরঙ্গ আলোর বেগে দৌড়োয় এবং ঐ তরঙ্গের শক্তিকে গোছাবদ্ধভাবে একটিমাত্র দিকে ছুঁড়ে মারা যায়।

প্রশ্ন হল, অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে আমরা কীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করব। তাদের ভাষা ত আমাদের জানা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। মহাকাশ জুড়ে বিপুল পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণুরা ছড়িয়ে রয়েছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটনের চারপাশে ঘুরপাক খাবার সময় একটি ইলেকট্রন ওর অক্ষের চারপাশেও ঘুরপাক খায়। এই ঘুরপাক খাবার যে গতি তার দিক পরিবর্তন ঘটলেই পরমাণুটি থেকে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার তরঙ্গের বিকিরণ ঘটবে। এই বিকিরণ সংক্রান্ত গবেষণা বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান কাজে

বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করছে। তাঁদের যুক্তি হল, অন্যান্য সৌরজগতের গ্রহলোকের বুদ্ধিমান জীবেরা তাদের শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের সাহায্যে ২১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ তৈরি করে কোন অর্থবহ বেতার সঙ্কেতকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিতভাবেই পাঠাচ্ছেন। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেবেন অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরাও এই তরঙ্গের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত।

আকাশভরা অসংখ্য গোলমেলে তরঙ্গের মধ্য থেকে ক্ষীণ অর্থবহ সঙ্কেতদের বেছে নেবার কাজটি অসাধারণ জটিল। এ যেন কয়েক লক্ষ মানুষের মিলিত চিৎকারের মধ্য থেকে গুটিকয়েক কণ্ঠস্বরকে বেছে নেবার মত একটি ব্যাপার।

বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বে তিন ধরণের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা বলছেন। এক—পৃথিবীর বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির কাছাকাছি কোন সভ্যতা। দুই—এমন একটি সভ্যতা, যে তার নক্ষত্ররূপী সূর্যের বিকিরিত সমগ্র শক্তিকে কব্জা করে তাকে কাজে লাগাবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তিন—এক অসীম উন্নত জাতের সভ্যতা, যার হাতে আমাদের ছায়াপথরূপী একটি গোটা তারাজগতের সমগ্র বিকিরিত শক্তিকে করায়ত্ত করা এবং তাকে কাজে লাগাবার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

কিছু বিজ্ঞানী আবার একটি বিচিত্র কথা বলছেন। অসীম উন্নত জাতের সভ্যতার অধিকারীরা হয়ত ইতিমধ্যেই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে বসে আছেন। তারা যদি আমাদের মত নিম্নমানের সভ্যতার সঙ্গে আদৌ কোন যোগাযোগ সাধন করতে উৎসাহী না হন—ঘটনাটা তো এমনও হতে পারে।

আমরা তাহলে কি করব ?

আমরা যদি মনে করি এই মহাবিশ্বে উন্নত সভ্যতা বিরাজ করছে, তাহলে পৃথিবীর মানুষ কি কোনদিন ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধন করতে পারবে? দুটো উপায়ের কথা বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন,

যেগুলোকে প্রায় অলীক কল্পনার পর্যায়েই মনে হবে আমাদের কাছে। একটি হল, নক্ষত্রলোকের দিকে সুদীর্ঘ সময়কালীন মহাকাশযাত্রার সময় মানুষের সমগ্র জৈবিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপকে মন্থর করে তোলা। এক পরম শীতল পরিবেশের মধ্যে যদি হিমায়িত করে রাখা যায় মানুষের দেহকে, একমাত্র তাহলেই সেটা সম্ভবপর হতে পারে। মানবদেহের ক্ষয়ের কাজ সে অবস্থায় চলতে থাকবে অতি ধীরগতিতে। এ নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এই বিষয়ের ওপর কিছু রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান জাতীয় চলচ্চিত্রও আমরা দেখেছি।

আর একটি উপায় হল, এমন একটি মহাশক্তিমান রকেটযন্ত্রের উদ্ভাবন করা, যা ছুটবে আলোর বেগের কাছাকাছি এক বেগে। ব্যাপারটা মনে হয় অবিশ্বাস্য, কারণ বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুতগামী যে রকেট যন্ত্রের আমরা উদ্ভাবন করতে পেরেছি তার বেগ হল ঘণ্টায় মাত্র ২৫০০০ মাইল। কিন্তু সত্যিই যদি ঐ অবিশ্বাস্য বেগসম্পন্ন ফোটন রকেটের নির্মাণ কাজ সুদূর ভবিষ্যতেও কোনদিন সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তাহলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী ঐ রকেটের অভিযাত্রীদের ঘড়ির কাঁটা পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় বহুগুণ মন্থরগতিতে চলতে থাকবে। মানুষের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনটাও যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। ফোটন রকেটের বিপুল বেগের অধিকারী মানুষের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের গতি এতটাই মন্থর হয়ে আসবে যে তার শরীরের ক্ষয় প্রায় ঘটবে না বললেই চলে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে সময়ের মাপ দাঁড়াবে কয়েক লক্ষ বছর, ফোটন রকেটের ক্ষেত্রে তা দাঁড়াবে মাত্র কয়েক বছরের কোঠায়। ফোটন রকেটের যাত্রী মানুষও তাই লক্ষ লক্ষ বছরের আয়ুর অধিকারী হয়ে উঠবেন।

রূপকথার রাজকুমারী ওজমা

আমাদের বিশ্বের অন্য সৌরজগতের কোন সভ্যতা থেকে সত্যিই অর্থবহ কোন সঙ্কেত পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছে কি না, কল্পনার স্তর পেরিয়ে তার প্রথম বাস্তব যে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার নাম হল ওজমা। ওজ হল মানুষের কল্পলোকের রূপকথার এক জগৎ—সেখানকার রাজকুমারী ওজমার নামে এই পরিকল্পনাকে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রধান নায়ক ছিলেন বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক। পরীক্ষার স্থান ছিল অ্যামেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীনব্যাঙ্কে অবস্থিত ন্যাশনাল রেডিও অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি (জাতীয় জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা সংক্রান্ত মানমন্দির)।

পরিকল্পনাটা ছিল এই—মানমন্দিরের ৮৫ ফুট ব্যাসের বেতার দূরবীনে মহাকাশ থেকে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার তরঙ্গ বিশেষ ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হবে দুটি নক্ষত্র—টাও সেটি ও এপসাইলন এরিদানি থেকে এবং ঐ তরঙ্গের মধ্যে কোন অর্থবহ সঙ্কেত রয়েছে কিনা, সোজা কথায় ঐ দুটি তারার কোন গ্রহে বুদ্ধিমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে কিনা, তাও অনুসন্ধান করা হবে। দুটি নক্ষত্রেরই আমাদের কাছ থেকে দূরত্ব হল ১১ আলোক-বর্ষ।

গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দিরের ডিরেক্টর ছিলেন অটো স্ট্রুভে—পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জোতির্বিদ। স্ট্রুভের মতে এই পরিকল্পনার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তেই যে কাছাকাছি অন্য সৌরজগতের কোন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সাধিত হবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই সমগ্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বেতার জ্যোতির্বিদ্যা একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হবে, তা আবার একই লক্ষ্যপূরণে নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করবে। ক্রমিকভাবে এই প্রচেষ্টাকে চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন না বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সংযোগ সাধিত হয়। ক্রমিক প্রচেষ্টার মাঝে থাকবে বিরতির পর্যায়, যান্ত্রিক উৎকর্ষতার মানকে এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতিকে বিশ্লেষণের জন্যে ঐ সময়টুকু কাজে লাগান হবে।

১৯৬০ সালের ৮ এপ্রিল সকাল চারটে নাগাদ গ্রীনব্যাঙ্কের বেতার দূরবীনকে যখন টাউ সেটির দিকে নিবদ্ধ করা হল, তখন সকলেরই মনে এক বিপুল উত্তেজনা। পরিকল্পনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউই অবশ্য এই প্রচেষ্টার সাফল্যের আশা করেন নি। তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি অনুসন্ধানের কাজে তাঁরা যে হাত দিতে চলেছেন, সেটা সবাই উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৬০ সালের মে, জুন ও জুলাই মাসে মোট ১৫০ ঘণ্টা ধরে দুটি নক্ষত্র থেকে অভীপ্সিত তরঙ্গের অনুসন্ধান চলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ধরা পড়ল না। ওজমা পরিকল্পনার প্রাথমিকভাবে যদিও এখানেই ছেদ টানতে হল, পরিকল্পনার দুই প্রধান হোতা ড্রেক ও স্ট্রুভে দুজনের কেউই কিন্তু নিরুৎসাহিত হন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, এজাতীয় অনুসন্ধান কাজে সাফল্য অর্জনের জন্যে আরও সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে একটানা দীর্ঘকাল ধরে।

টাউ সেটি এবং এপসাইলন এরিদানির কোন গ্রহে বুদ্ধিমান জীব বসবাস করছে এবং সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, ঘটনাটা আদৌ তা নাও হতে পারে। হয়ত ওরা রয়েছে ২০, ২৫ কিংবা ১০০ বা ৫০০ আলোক-বর্ষ দূরের কোন গ্রহজগতে। বিশ্বের অজানা সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ কবে কীভাবে সাধিত হবে, তা আমাদের জানা নেই। এই মুহূর্তেও হতে পারে, আবার বহু শত বছর বাদেও হতে পারে। ওজমা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তার প্রথম পদক্ষেপটুকু শুরু হয়েছিল মাত্র।

দানিকেন ও 'দেবতারা'

এরিখ ফন দানিকেন হলেন একজন লেখক। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্য দিয়ে একটি ধারণা তিনি জোরালভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন এবং এই ব্যাপারটাকে নিয়ে আমাদের দেশের কিছু কিছু

মহলে ইতিপূর্বে বেশ খানিকটা সোরগোলও সৃষ্টি হয়েছিল। দানিকেন বলতে চাইছেন সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা (যাদের তিনি দেবতা নামে অভিহিত করেছেন) অতীতকালে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সংক্রান্ত পৃথিবীর অনেক কিছু নিদর্শনই তাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে কলমে শিখিয়েছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি অন্য সৌরজগতে উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা আমাদের কতটা কাছাকাছি থাকতে পারেন। খুব সম্ভবত ১১, ১২ আলোক-বর্ষ দূরত্বের মধ্যে ওরা নেই। ২০ বা ২৫ আলোক-বর্ষ দূরে থেকেও যদি ওদের আসতে হয়, তাহলে এক অসামান্য শক্তি ও বেগসম্পন্ন রকেট যন্ত্র ওদের উদ্ভাবন করতে হবে। এই উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা পৃথিবীতে পৌঁছে মিসরের পিরামিড ও মমি, ইস্টার দ্বীপপুঞ্জে কিছু পাথরের মূর্তি, ভারতের লৌহ স্তম্ভ জাতীয় সাধারণ মানের কিছু প্রয়োগবিদ্যা আমাদের পূর্বপুরুষদের শেখাতে যাবেন কেন? আমরা তাদের কাছে প্রত্যাশা করব এক উচ্চমানের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, অটোমেশন বিদ্যা প্রভৃতি, যা আজও আমাদের কাছে স্বপ্নাতীত। সে জাতীয় কোন নিদর্শন কিন্তু তারা রেখে যান নি।

মিসরের পিরামিড বা মমি, ভারতের লৌহস্তম্ভ এবং এজাতীয় প্রাচীন পৃথিবীর আরও বহুবিধ বস্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে তৈরি করেছিলেন, তার বিস্তৃত নথিপত্র কিন্তু অনেকদিন আগেই পাওয়া গেছে। কাজেই এই বস্তুগুলো নির্মাণ কাজের কৃতিত্ব আমরা অকারণে দানিকেনের তথাকথিত দেবতাদের দিতে যাব কেন? তাতে দেবতাদের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করা হয় না কি?

অতীত পৃথিবীর কোন নিদর্শন তৈরির পেছনে যদি সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা না যায়, তাহলেই কি তার কৃতিত্ব দেবতাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হবে? ধরা যাক, অতীত যুগের কোন বাড়ির ছাদের ওপর দুখানা ইঁট পড়ে আছে। ইঁট দুটো কীভাবে ওখানে পৌঁছেছে জানা

নেই। দানিকেন কি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, দেবতারাই ইঁট ত্বটো ওখানে বসিয়ে দিয়েছেন।

রামায়ণের পুষ্পক রথ এবং মহাভারতের পাশুপত অস্ত্র যেহেতু কেউ দেখেনি, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে ওরা হল মহাকাশযান ও পারমাণবিক মারণাস্ত্র এবং দেবতারাই ওদের নির্মাণ কৌশল শিখিয়েছিলেন। যে যুগের মানুষ কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবহারের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত হন নি, তারা রকেটের জ্বালানি ও পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মাণকৌশল বুঝবেন কী করে? এই সহজ ও অতি স্পষ্ট যুক্তিকে এড়িয়ে কিছু তথাকথিত 'দানিকেন প্রেমিক' যে এক হাল্কা কল্পনাকে আলিঙ্গন করছেন, তুর্ভাগ্যবশত তাঁরা তা বুঝতেই পারছেন না।

৫০ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, মানুষ একদিন চাঁদে যাবে। তাই বলে কি আমরা বলব যে চাঁদে যাবার ব্যাপারটা দেবতাদেরই কারসাজি? তু হাজার বছর আগেকার অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ আমাদের হাতে নেই! সঙ্গে সঙ্গে কি আমরা তার পেছনে দেবতাদের হস্তক্ষেপ আছে বলে ধরে নেব।

সোজা কথায়, দানিকেন দেবতাদের হাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের একেবারে খেলার পুতুল দাঁড় করাতে চাইছেন, তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার মৌলিকত্বকে মেনে নিতে তিনি নারাজ। এখানেই তাকে কল্পকাহিনীকার হিসেবে চিনে নেওয়া যায়।

বিজ্ঞানের বেশ কিছু স্বীকৃত সত্য সম্বন্ধে দানিকেনের অজ্ঞতা বিস্ময়জনক। উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষ এসে হাজির হয়েছে, তারপর পৃথিবীর আওতায় সে বীজকণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, আলোকের জীবনদায়ী প্রভাবে বিকশিত হয়েছে উন্নততর কোষে, বিজ্ঞানী কেলভিনের এই পুরান তত্ত্বকে দানিকেন প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়বেন না। বিজ্ঞান জগতে এ ধারণাকে বাতিল করা হয়েছিল এ জন্যে যে, যে সব বীজাণু ফুটন্ত জলের তাপেও বেঁচে থাকে, ওরা কিন্তু যে মুহূর্তে বায়ুহীন

মহাকাশে হাজির হবে, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেহজাত অতিবেগুনী রশ্মির সংঘাতে মারা পড়বে। জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগানের মতে উল্কাবাহী এসব প্রাণবীজ পৃথিবী থেকে মঙ্গল পর্যন্ত পথ পেরোবার আগেই মারা পড়বে।

দানিকেন জাতীয় কল্পবিজ্ঞানমূলক লেখকদের বক্তব্যের ওপর আমাদের দেশে এবং বিদেশে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরা কিন্তু আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

পৃথিবীর নবীনতম পর্বত

হিমালয় এই নামটির সঙ্গেই ভারতের আত্মার যেন এক নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে এই আত্মিক সম্পর্কের এক মর্মবাণী আমরা লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। হিমালয় হল পৃথিবীর নবীনতম পর্বত, সাগরের গর্ভ থেকে এর জন্ম হয়েছে মাত্র দু কোটি বছর আগে। মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ুস্রোতের বিরুদ্ধে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়, তা না হলে ভারতের সমগ্র জলবায়ুর চেহারাটাই যেত পালটে —অতি রুক্ষ শীতল অঞ্চলে পরিণত হত ভারতের এক বিরাট এলাকা।

হিমালয়ের সবকিছুই যেন তুলনাহীন—পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত, সর্বোচ্চ গিরিখাত, সর্বোচ্চ গিরিপথ, সর্বোচ্চ উচ্চতায় বসবাসকারী প্রাণী, সবকিছুরই অধিষ্ঠান হল এখানে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০০ ফুটের ওপরে। এছাড়াও হিমালয়ে রয়েছে আরও দুটি শৃঙ্গ—কাঞ্চনজঙ্ঘা ও K-2, যাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ২৮০০০ ফুটের ওপরে। ২৬০০০ ফুটের ওপরে উচ্চতা—এরকম শৃঙ্গের সংখ্যা হিমালয়ে রয়েছে তেরটি। ওদের নামগুলোও ওদের চেহারার মতই অসামান্য—লোতসে, মাকালু, ধবলগিরি, নন্দা পর্বত, অন্নপূর্ণা, চো ইয়ু, মানাসলু ইত্যাদি।

কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ সমেত হিমালয়ের মোট দৈর্ঘ্য হল প্রায় ১৭০০ মাইল এবং সাতটি দেশের মধ্য দিয়ে এ প্রসারিত—ভারত, ভূটান, নেপাল, পাকিস্তান, চীন (তিব্বত সমেত) ও আফগানিস্তান। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মানুষের পদক্ষেপ পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সে কখনই মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। এক নন্দা পর্বত জয়ের অভিযানেই তিরিশ জন অভিযাত্রীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

পর্বতদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন ওরা বরাবর ওখানেই রয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই প্রকৃতি যেন ওদের তৈরি করে বসে আছে। কিন্তু সত্যিই তো আর ওরা অতটা স্থায়ী ব্যাপার নয়। ওদের তৈরির পেছনে রয়েছে এক বিপুল পরিমাণ শক্তির খেলা।

প্লেট টেকটনিক্স তত্ত্ব অনুযায়ী মহাদেশ ও মহাসাগর সমেত গোটা পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ অনেকগুলি প্লেট বা ভেলার সমবায়ে তৈরি—এরা প্রায় চল্লিশ মাইলের মত পুরু। পৃথিবীর ত্বকের (ক্রাষ্ট) নিচে যে শিলাস্তর রয়েছে, তার ওপর এই প্লেটগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। এদের গতির পরিমাণ খুবই মন্থর, বছরে হয়ত আধ থেকে চার ইঞ্চির মত। প্লেটগুলো পরস্পরের গা ঘেঁষে, অনুভূমিক বা লম্বভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। যখন মহাদেশের প্লেটগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, নতুন সমুদ্র মাঝখানের জায়গাটা জুড়ে বসে। আবার যখন ওরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, ওরা তৈরি করে বসে পর্বতকে, কারণ মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে শিলাস্তর রয়েছে তার ওপরের দিকে যাওয়া ছাড়া ত আর কোন উপায় নেই। কালের বিচারে এ জাতীয় এক একটি ঘটনা ঘটতে অবশ্য বহু কোটি বছর পেরিয়ে যায়।

পৃথিবীর নবীনতম পর্বত হিমালয়ের ওপরের দিকে বৃদ্ধির পালা কিন্তু এখনো শেষ হয় নি। ওর দেহের কাঠামোর মধ্যে গঠনগত পরিবর্তনও চলেছে অনবরত। গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই বৃদ্ধির পরিমাণটা মাপা হচ্ছে। দেখা গেল, প্রতি বছর এই বৃদ্ধির মাপ তিন থেকে চার ইঞ্চির মত। কিন্তু বাতাস ও জলের দ্বারা ক্ষয়ের পরিমাণটা হিসেবের মধ্যে ধরলে এই বৃদ্ধির মাপটা দাঁড়াবে প্রতি একশ বছরে কয়েক ইঞ্চির মত। ১৯৫২ সালে একজন ভূবিদ পর্বত অভিযাত্রীদের উদ্দেশে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে এভারেস্ট বেশি উঁচু হয়ে ওঠার আগেই ওর চূড়োয় পৌঁছবার কাজটা সেরে ফেলতে পারলে ভাল হয় না কি! ১৯৫৩ সালেই অবশ্য এভারেস্টের প্রথম বিজয় পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল।

হিমালয়ের সমগ্র এলাকা জুড়ে একদিন ছিল সাগরের রাজত্ব।

সেই সাগরের গর্ভে হিমালয়ের শিলাদেহ গড়ার কাজ চলছিল বহু বছর ধরে। মাত্র দু কোটি বছর আগে সেই সাগর থেকে হিমালয়ের মাথা তুলে দাঁড়ানোর ঘটনাটা ভূতাত্ত্বিক কালের বিচারে হল এই সেদিনের ঘটনা। হিমালয়ের দক্ষিণের অংশ শিবালিক পর্বতের জন্ম হয়েছে মাত্র পনের থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে।

পর্বতের চারটি অংশ

ভৌগোলিক এবং গঠনগত বিচারে ১৭০০ মাইল দীর্ঘ, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদের দুই বিশাল বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হিমালয় পর্বতকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়। একেবারে দক্ষিণে হল শিবালিক পর্বত, কুড়ি লক্ষ থেকে দু কোটি বছর বয়সের অতি নবীন শিলায় যার দেহ গঠিত। এর সমগ্র এলাকা জুড়ে অস্থির ও পরিবর্তনশীল চরিত্রটাই ধরা পড়ে—খাড়া পাহাড়ের গা জুড়ে ধসের মেলা এবং অতি গভীর উপত্যকাভূমির চারপাশ জুড়ে ভেঙ্গে পড়া পাথরের দেওয়াল রয়েছে ছড়িয়ে।

শিবালিকের উত্তরে হল ক্ষুদ্র হিমালয়—দুয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সীমারেখারূপী এক বিশাল ফল্ট। ফল্ট হল ভূপৃষ্ঠের ওপর এমন একটি ফাটল যার এক পাশের জমি বা শিলাস্তর অন্য পাশের জমি বা শিলাস্তরের সঙ্গে অনুভূমিক বা লম্বভাবে স্থান পরিবর্তন করে বসে আছে। ক্ষুদ্র হিমালয়ের শিলার বয়স প্রায় ষাট কোটি বছর। অর্থাৎ সাগরের গর্ভে পর্বত তৈরির কারখানায় পলির সমবায়ে গড়ে ওঠার পর সুদীর্ঘকাল ওরা আত্মগোপন করে ছিল। হিমালয়ের এই অংশটি ভূতাত্ত্বিক বিচারে শান্ত এবং স্থিতিশীল অবস্থাতেই রয়েছে। যে শিলার সমবায়ে এ তৈরি ওরা একদিন অভিযান শুরু করেছিল আরও উত্তরের অঞ্চল থেকে এবং বহু লক্ষ বছর ধরে অতি ধীর মন্থর গতিতে বহু মাইলের পথ পাড়ি জমিয়ে ওদের বর্তমান অবস্থান ভূমিতে এসে পৌঁছেছে।

বিশেষজ্ঞদের পরিমাপ অনুযায়ী গত দশ থেকে পনের হাজার

বছরে হিমালয় দক্ষিণ দিকে এগিয়েছে কয়েক মাইলের মত পথ। ওর দু কোটি বছরের জীবনে দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে এই অগ্রগতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১২৫ মাইল।

ক্ষুদ্র হিমালয়ের দক্ষিণে হল বৃহৎ হিমালয়। দুয়ের মধ্যে রয়েছে ভূস্তরের এক বিশাল ফাটল—মেন সেণ্ট্রাল থ্রাস্ট। থ্রাস্ট হল ভূস্তরের এমন একটি ফাটল, যেখানে জমির একটি অংশ তার নিচেকার অংশের ওপর অনুভূমিকভাবে স্থানচ্যুত হয়ে বসে আছে। বৃহৎ হিমালয়ের এলাকা জুড়ে রয়েছে বিশাল উচ্চ অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ, খরস্রোতা বহু নদীর প্রবাহ। ভূতাত্ত্বিক বিচারে হিমালয়ের এই অংশ এখনও খুবই সক্রিয়।

বৃহৎ হিমালয়ের শিলার বয়স প্রায় ১৩০ থেকে ১৪০ কোটি বছর এবং এখানে পর্বতের উচ্চতা খুব ধীর মন্থর গতিতে বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে জল বাতাস ও বরফের ক্ষয়কাজের পালা চলেছে এর সর্বাঙ্গ জুড়ে।

বৃহৎ হিমালয়ের উত্তরে হল টেথিস্ বা তিব্বত হিমালয়, যা প্রধানত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এবং এর শিলার মধ্যে রয়েছে অজস্র প্রাণীদেহের জীবাশ্ম। এথেকে এর বয়সের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে সাত থেকে ষাট কোটি বছরের মত—বৃক্ষপত্রহীন জনবিরল হিমশীতল প্রায় মরুভূমির মত একটি পরিবেশ। ভূতাত্ত্বিক বিচারে হিমালয়ের এই অংশটি আবার খুব সক্রিয় নয়।

হিমালয়ের চারটি অংশের মধ্যে শিবালিক ও বৃহৎ হিমালয় ভূতাত্ত্বিক বিচারে সবচেয়ে সক্রিয়, এই দুই অঞ্চল জুড়ে অজস্র ভূমিকম্পের ঘটনার মাধ্যমে যার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের ফলে পর্বতের শিলার হঠাৎ স্থানচ্যুতি ভয়ঙ্কর বিপদকে ঘনিয়ে তোলে। ১৮৪১ সালে নন্দা পর্বতের পশ্চিম দিক থেকে বিপুল পরিমাণ শিলা ভূমিকম্পের ফলে স্থানচ্যুত হয়ে সিন্ধুনদের ওপর গিয়ে হাজির হয় এবং নদীর জলের প্রবাহপথকে রুদ্ধ করে প্রায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদকে তৈরি করে বসে। কয়েক মাস বাদে এই স্বল্পকালীন বাধাটি

যখন ধ্বসে পড়ল, এক প্রলয়ঙ্কর বন্যা দেখা দিল তার ফলে। ঐ বন্যার জল নিচের দিকে একশ মাইল দূরে আটক নামে একটি জায়গায় এক শিখ সেনাবাহিনীর ছাউনীর সমস্ত সৈন্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে হিমালয়ের নেপাল অঞ্চলে একটি ভূমিকম্পের ফলে দশ হাজারের ওপর মানুষ মারা যায়।

পাহাড়ের জন্ম

হিমালয়ের সৃষ্টিপর্বের সূচনা প্রায় ১৩০ থেকে ১৪০ কোটি বছর আগে, যখন এক বিশাল সমুদ্রের (টেথিস সমুদ্র) গর্ভদেশ জুড়ে পলির একজায়গায় জড় এবং ঘনীভূত হবার পালা শুরু হয়েছিল। সেই সমুদ্রের অবস্থানক্ষেত্র বর্তমান হিমালয়ের এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণে হয়ত বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাগরগর্ভে এই পলি জমার কাজ চলেছিল বহু কোটি বছর ধরে। সাত সাড়ে সাত কোটি বছর আগে শুরু হল মূল নাটকের পালা। ভারতের চলমান প্লেটটি উত্তরে তিব্বতের প্লেটটির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে মধ্যবর্তী টেথিস সমুদ্রের গভীরতা উঠল বেড়ে এবং ওর উত্তরের সীমানা জুড়ে দেখা দিল গভীর ফাটল। এই গভীর ফাটলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গুরুমণ্ডল (ম্যাণ্ট্‌ল) থেকে বিপুল পরিমাণে কৃষ্ণকায় এবং ভারী আগ্নেয় শিলা বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

যত দিন যায়, টেথিস সাগরের আয়তন ক্রমেই ছোট হতে শুরু করে এবং তারপর প্রায় দু-কোটি বছর আগে মধ্য মায়োসিন যুগে শুরু হল পর্বতের জন্ম প্রক্রিয়া। ১৪০ কোটি বছর ধরে যে অঞ্চল জুড়ে ছিল সাগরের অপ্রতিহত রাজত্ব এখন সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল পর্বত, সাগরগর্ভে বহু কোটি বছর ধরে জড় হতে থাকা পলিরা প্রচণ্ড চাপের পেষণে শিলাতে রূপান্তরিত হয়ে যে পর্বতের দেহকে গড়ে তুলছিল। সদ্যজাত পর্বতের দেহের ওপর তৈরি হতে থাকে ক্রমবর্ধমান চাপ, যে চাপের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত ভঙ্গিল শিলার স্তূপ ওদের জন্মকালীন ভিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমেই দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু

করল। যেখানে এসে ওরা স্থিতিলাভ করল, সেটাই হল বর্তমানের ক্ষুদ্র হিমালয়ের এলাকা। সিমলা, রাণীক্ষেত, আলমোড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতি শৈলনিবাসগুলো এজাতীয় উদ্ভিন্ন এবং স্থানান্তরিত শিলাস্তূপের ওপরেই গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর গভীরে তার ত্বকরূপী অংশ প্রচণ্ড চাপের পেষণে যেখানে গলিত অবস্থা লাভ করেছিল, গ্র্যানিটরূপী ম্যাগমা বা গ্যাসযুক্ত লাভা সেখানে তৈরি হল। এই গলিত বস্তু ভূপৃষ্ঠের ওপরে পৌঁছে জমাট বেধে গিয়ে তৈরি হল ভবিষ্যতে যা বৃহৎ হিমালয়রূপে গড়ে উঠবে তারই ভিতপ্রস্তর। বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী এলাকায় যে গ্র্যানিট শিলাস্তর আমরা দেখতে পাই, তা অতীতের সেই ঘটনারই সাক্ষ্য প্রমাণকে ধারণ করছে।

ক্ষুদ্র হিমালয়ের দক্ষিণে টেথিস্ সাগরের যে অংশ তখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছিল, তার গর্ভে সঞ্চিত পলি থেকে তৈরি শিলার স্তূপ মাথা তুলে পর্বত গড়ার আর একটি অধ্যায়ের সূচনা করল কুড়ি থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে—শিবালিক পর্বতের জন্ম হয়েছিল এভাবেই।

হিমালয়ের শিলাদেহ যে একদিন সাগরের গর্ভেই তৈরি হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এখনও সে তার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবাশ্মকে ধারণ করছে। হিমালয়ের ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় পাওয়া গেছে অ্যামোনাইট নামে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম, যারা সাগরে বহু কোটি বছর ধরে বংশবৃদ্ধি করার পর পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যায়। হিমালয়ের সর্বোচ্চ প্রদেশে পাওয়া যায় চুনাপাথর, সাগরের গর্ভে সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহের খোলস ক্রমাগত জমা পড়ে পড়ে যা তৈরি হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল একটিই। মহাদেশের প্লেটগুলোর মধ্যে যখন সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রান্তভাগগুলো দুমড়ে ওপরের দিকে ঠেলে ওঠে, তখন সাগরের তলদেশের কিছুটা অংশ ঐ চাপের ঠেলায় ভূপৃষ্ঠের ওপরে এসে হাজির হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

পাহাড় অরণ্য নদী-নালা এই নিয়ে হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ। হিমালয়ের অরণ্য সম্পদ তার এক বিরাট ঐশ্বর্য। পর্বতের সানুদেশ থেকে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত হল পাইন, চীর, ফার প্রভৃতি বড় গাছেদের রাজত্ব। তারপর থেকে শুরু করে পনের হাজার ফুট পর্যন্ত বিভিন্ন গুল্ম ও শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদদের দেখা যায়।

গোটা হিমালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে অরণ্যের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মানুষ অনেক সময় লোভের বশবর্তী হয়ে এই অরণ্যকে নির্বিচারে ধ্বংস করছে। গাছেরা যে মৃত্তিকা তৈরি করে, তা পাহাড়ের শিলাস্তরকে জলের ক্ষয়কাজের হাত থেকে রক্ষা করে। মৃত্তিকার অভাবে শিলাস্তর দুর্বল হয়ে পাহাড় জুড়ে নামছে ধস। এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃতির প্রতিশোধ ভবিষ্যতে কতটা মর্মান্তিকরূপে দেখা দেবে, তা কিন্তু বর্তমানে আঁচ করার কোন উপায় নেই।

হিমালয়ের ভূ-প্রকৃতি এমনই দুর্গম যে এখানে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কাজ সহজে চালান সম্ভবপর নয়। কিছু কিছু খনিজ সঞ্চয়ের সন্ধান অবশ্য পাওয়া গেছে, যেমন আলমোড়া এবং সিকিমে তামা, আলমোড়া জেলার সরযূ উপত্যকায় সোপস্টোন, কাশ্মীরের রিআংসি এবং দার্জিলিং জেলায় পর্বতের সানুদেশে মাল এবং বাগরাকোট অঞ্চলে কয়লা, কাশ্মীরের লাদাখ এবং রূপস্থুতে লবণ ও বোরাক্স ইত্যাদি। অর্থনৈতিক বিচারে হিমালয়ের সব খনিজের উদ্ধার কাজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লাভজনক হয়ে উঠবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

হিমালয়ের সমগ্র এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খরস্রোতা নদী। এসব নদী থেকে জলবিদ্যুৎ সংগ্রহের জন্যে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা কিছু কিছু জায়গায় কার্যকরী করা হয়েছে, কিছু হবার পথে। বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ

করছেন। হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশি সেখানে নদীতে বাঁধ তৈরি করলে বাঁধ এবং বিপুল পরিমাণ জলের চাপে ভূগর্ভের শিলাস্তর স্থানচ্যুত হয়ে ভূমিকম্পের ঘটনাগুলোকেই বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এজাতীয় নির্মাণ কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্যই অবশ্য বিশেষজ্ঞেরা পরামর্শ দিচ্ছেন।

সাদাসিধে সরল মানুষেরা

হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা জুড়ে কত বিচিত্র মানুষের বাস। এদের মধ্যে রয়েছে উপত্যকা ভূমির বাসিন্দা সরল, সাদাসিধে মানুষেরা, আধা যাযাবর উপজাতি শ্রেণীর মানুষেরা এবং অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যাণ্ডের কিছু কিছু এককালীন নরমুণ্ড শিকারী মানুষদের বংশধরেরা। হিমালয়ের প্রাকৃতিক বাধার জন্যই বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত পারস্পরিক মেলামেশা খুব সহজে ঘটতে পারেনি। হিমালয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের জন্যেই হয়ত এখানকার মানুষেরা যেমন সরল, তেমনি সৎ, সাহসী, সুখী এবং আনন্দপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে।

পাঞ্জাবের সমতল ভূমির মানুষের পোষাক এবং ভাষাগত যে সংস্কৃতি, তা কাশ্মীরের পীরপাঞ্চাল পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত মানুষদের মধ্যে বিস্তৃত। পর্বতের উত্তর দিকে কাশ্মীরের উপত্যকা জুড়ে আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতিনীতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রাধান্য। কাশ্মীরের মুসলমান মেয়েরা পর্দা ব্যবহার করে না। শ্রীনগরে শরীর ঢাকার জন্য যে বোরখা মেয়েরা ব্যবহার করে, তা প্রধানত আদব কায়দার জন্যে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে বোরখার চল নেই বললেই চলে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি এক পুরুষের বহুবিবাহ এবং এক নারীর বহু পুরুষকে বিবাহরূপী প্রথার মধ্যে। এক পুরুষের বহু বিবাহের চলটা রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে, যেমন কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলে। আবার এক নারীর বহু

পুরুষকে বিবাহের চল রয়েছে কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলে যেখানে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তিব্বতের লামাবাদের এক সমন্বয় ঘটেছে।

হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় এক নারীর বহু পুরুষকে বিবাহের ক্ষেত্রেও নানা রকমফের দেখা যায়। লাহুলে সমাজ হল মাতৃতান্ত্রিক। এখানে একটি নারীর একাধিক স্বামী থাকতে পারে যারা সবাই কাজ করে মেয়েটিরই জন্য। হিমাচল প্রদেশের জৌনসার-বাওয়ার অঞ্চলে অনেক সময়েই দেখা যায়, একটি পরিবারের সব ভায়েদেরই একটিমাত্র স্ত্রী, একমাত্র সবচেয়ে বড় ভায়ের সঙ্গেই হয়ত মেয়েটির আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ ঘটেছে।

নাগাদের মধ্যে

মণিপুরের উপত্যকার উত্তর এবং পশ্চিমে বাস করে নাগারা। নাগাদের মধ্যে বহু গোষ্ঠী আছে—প্রধান দুটি গোষ্ঠী হল আঙ্গামী ও সেমা। প্রতিটি গোষ্ঠী ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে।

মণিপুরের মত নাগাদের সমাজ কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক নয়। নাগারা খাদ্য হিসাবে কুকুরের মাংস খুবই পছন্দ করে। নাগাদের মধ্যে দু এক পুরুষ আগেও মাথা শিকার করাটা ছিল একটা গৌরবজনক সামাজিক প্রথা। বিবদমান দুটি নাগা গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধে কোন পক্ষের শত্রু যখন নিহত হত, তখন অপরপক্ষের কোন অবিবাহিত নাগা যুবক নিহত শত্রুর মাথাটা নিত কেটে। তারপর ঐ মাথা স্বজাতিদের কাছে দেখিয়ে যেমন নিজের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিত, তেমনি তার প্রেমাস্পদের প্রণয়ও অর্জন করত।

নাগাদের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে লেখকের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। প্রায় বছর কুড়ি আগে কোহিমার কাছে একটি নাগা গ্রামে আমার যাবার সুযোগ হয়। সঙ্গে ছিলেন এ গ্রামেরই অধিবাসী আমার এক নাগাবন্ধু। গ্রামের সর্দারের বাড়িতে গিয়ে আমরা যখন উপস্থিত হলাম তখন তিনি বেশ কিছুক্ষণ আমাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে হঠাৎ আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে একেবারে

দলা দলা থুতু আমার সমস্ত মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। আমিত হতবাক, খানিকটা আতঙ্কগ্রস্তও বটে। এই কি নাগাদের অতিথি সংবর্ধনার রীতিপদ্ধতি। আসল মতলবটা কি আঁচ করার চেষ্টা করছি। মাথাটা নিশ্চয়ই কাটবে না। পেছন থেকে দেখি, আমার নাগা বন্ধুটি আমাকে বলছে তুমিও ওর মুখে থুতু ছেটাও।

আমার স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে অভ্যর্থনার রকমসকমে গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছিল। নাগা বন্ধুটির ওপর প্রচণ্ড রাগও হচ্ছিল। এজাতীয় একটি ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা ত ওর আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। যাই হক, যে দু চার ফোঁটা জল আমি মুখে সংগ্রহ করতে পারলাম, তাই নাগা সর্দারের মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সেত একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আসলে ব্যাপারটা যা ঘটেছিল, তা হল এই—আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে নাগা সর্দার তার এই মনোভাবটাই প্রকাশ করতে চাইছিল যে আমি হলাম তার মহামান্য অতিথি। আর আমি যদি পালটা তার মুখে থুতু না ছেটাতাম, তাহলে তার অর্থটা দাঁড়াত এই যে আমি তার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করতে রাজি নই। তার পরিণতি যে খুব শুভ হত না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নাগা সর্দার এরপর আমাকে কুকুরের মাংসের ভোজ খাওয়াবার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, যে পরম রমণীয় কাজটি থেকে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য আমাকে তখন বিশেষভাবেই সচেষ্ট হতে হয়েছিল।

অতিথি সংবর্ধনার এ জাতীয় প্রথা শুধু আমাদের দেশে কিছু কিছু নাগা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর আরো কিছু আদিম উপজাতির মানুষদের মধ্যেও রয়েছে।

গদ্দীরা

হিমালয়ের কুলু উপত্যকার অধিবাসী গদ্দীরা হল অতি আনন্দ-প্রিয় এক মানবগোষ্ঠী। আধা যাযাবর এবং আধা কৃষিজীবি মানুষ

হল এরা। পাহাড়ের নিচে উপত্যকাভূমির গ্রামে এদের সকলেরই ঘর-বাড়ি আছে, যেখানে তারা কিছু কিছু কৃষিকাজ করে থাকে। কিন্তু গদ্দীদের জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন হল মেষপালন। যেই গ্রীষ্মকাল এল, মেয়েরা পড়ে রইল গ্রামে আর ছেলেরা প্রায় সবাই তাদের ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে প্রায় ১৫০০০ ফুট উঁচু পার্বত্য এলাকায় চারণ-ভূমির দিকে রওনা হল। এখানে বছরের বেশ কয়েকটা মাস অত্যন্ত বিপদসংকুল ও কঠোর জীবনযাপন করতে হয় এদের। অনেক সময়ে নেকড়ে ও ভালুকের আক্রমণ থেকে ভেড়ার পালকে রক্ষার জন্য বিপদের ঝুঁকিও নিতে হয় তাদের।

প্রচণ্ড শীতের দিন যখন নেমে আসে ওপরের পার্বত্য অঞ্চলে, তখন ভেড়ার পাল নিয়ে গদ্দীরা কাংড়া উপত্যকায় পর্বতের সানুদেশে এসে হাজির হয়।

গদ্দীরা ওদের কোমরে যে লম্বা দড়ি বাঁধে, তা থেকেই ওদের সহজে চিনে নেওয়া যায়। যাযাবর বৃত্তির নেশা যেন ওদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। পথের বিপদ আপদ, বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝা কোনকিছুই তাদের নিবৃত্ত করতে পারে না। এই অভিযানে ছোট ছোট শিশুরাও অনেক সময় ওদের বাপ খুড়োদের সঙ্গে পাড়ি জমিয়ে বসে।

সমগ্র হিমালয় জুড়ে আরও কত উপজাতির মানুষের বসবাস—বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা, সামাজিক প্রথা, নিয়মকানুন ইত্যাদি। আমাদের নাগরিক জীবনে যেসব মানবিক মূল্যবোধকে আমরা অতি সহজে বিসর্জন দিয়ে বসে আছি, সেগুলোকেই এই অতি সরল ও সৎ মানুষগুলো এখনও ওদের জীবনযাত্রার মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

বন্য প্রাণীদের রাজত্ব

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে তুষারের রাজত্ব শুরু হবার আগে পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বহু বিচিত্র বন্য প্রাণীর বাস। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রাণীদের দেখা যায় নিম্নভূমির জঙ্গল বা তরাই অঞ্চলে।

এদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, বাঁদর, হাতি, কুমীর, গণ্ডার প্রভৃতি। শেষের তিনটি প্রাণী পর্বতের সানুদেশ থেকে খুব একটা ওপরের দিকে পাড়ি জমায় না। অন্য প্রাণীরা জঙ্গল থেকে অনেক সময়েই এসে হাজির হয় পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, যেখানে বাস করে শেয়াল, ভালুক, রেড প্যাণ্ডা এবং মানুষ। এর ওপরে রয়েছে তৃণ ভূমির প্রাণীরা—ইয়াক, বুনো গাধা, ভেড়া এবং ছাগল। তিনটি অঞ্চল জুড়েই রয়েছে হরিণ, যা হল মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য।

বর্ষণবহুল কোন অরণ্য অঞ্চলে একটি প্রাণীর সঙ্গে অন্য আর একটি প্রাণীর সংঘাত যেমন একটি সাধারণ ঘটনা, পার্বত্য এলাকায় নিষ্করুণ প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাতটাই আবার বড় হয়ে দেখা দেয়। প্রথম ক্ষেত্রে খাদ্যের যেমন প্রাচুর্য্য রয়েছে, অন্য ক্ষেত্রে তেমনি রয়েছে নিদারুণ অভাব।

গাছপালাদের রাজত্ব যেখানে শেষ, প্রাণীদের বিচরণক্ষেত্রও সাধারণত তার উর্ধ্বে যেতে দেখা যায় না—এটা মোটামুটি পনের হাজার ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এভারেস্ট পর্বতারোহীরা ২০,০০০ ফুট ওপরেও পাহাড়ী ভেড়াদের পদচিহ্ন দেখেছেন ; ২১০০০ ফুট ওপরে খরগোস ও খেঁকশিয়াল এবং ২১,৫০০ ফুট ওপরে দেখেছেন নেকড়েদের পদচিহ্ন।

লম্ফনশীল মাকড়সাদের ২২০০০ ফুট ওপরেও দেখা গেছে। ২২০০০ ফুট উচ্চতায় ঠাণ্ডার প্রকোপ খুবই বেশি। কিন্তু তা তুষাররেখার ওপরকার স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে বড় কোন সমস্যাই নয়। দিনের বেলা মাকড়সার কৃষ্ণ-ধূসর বর্ণের শরীরটা সূর্যের তাপ-শক্তিকে শুষে নেয় এবং তাপমাত্রা যখন খুব নেমে আসে, তখন শুরু হয় ওর শীত-নিদ্রা (হাইবারনেশান)।

হিমালয়ের সব প্রাণীদেরই সবচাইতে বড় শত্রু হল মানুষ। নির্বিচারে প্রাণীদের সে হত্যা করে ওদের লোমশ চামড়া বা অন্য কোন মূল্যবান উপাদানের লোভে। মাস্ক-ডিয়ার বা কস্তুরী মৃগদের কথাই ধরা যাক. নাভির পাশে একটি গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে কস্তুরীরূপী উপাদানটি

ওরা তৈরি করে, খুব দামী সুগন্ধি তৈরির কাজে যাকে লাগান যায়। ঠিক এই কারণেই ওরা মানুষের হাতে নির্দয়ভাবে মারা পড়ছে।

হিমালয়ের একটি বিচিত্র প্রাণী হল রেড প্যাণ্ডা, ৭০০০ থেকে ১২০০০ ফুট উচ্চতায় বৃক্ষবাসী জীবনযাপন করে এরা। সারাদিন ওরা গাছেই ঘুমিয়ে থাকে, সকাল ও সন্ধ্যায় মাটির ওপর খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। শরীরটা বেড়ালের মতই ছোট্ট, কিন্তু চেহারাটা দেখতে প্রায় ভালুকের মত।

প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের জঙ্গলগুলোতে যে দুটি বানরের প্রজাতিকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়, ওরা হল রিসাস্ ও ল্যাঙ্গুর। রিসাসকে দেখতে মোটেই সুশ্রী নয়। ল্যাঙ্গুরের মুখশ্রী ও লম্বা লেজটির জন্য প্রাণীটি বিশেষভাবে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। দুটি বানর প্রজাতিই অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বৃক্ষ রাজ্যের ওপর বিচরণ করে বেড়ায়। এক গাছ থেকে আর এক গাছের ডাল পর্যন্ত তিরিশ ফুট এরা স্বচ্ছন্দেই লাফিয়ে যেতে পারে। পরস্পরের প্রতি এদের যেমন সখ্যতার মনোভাব প্রকাশ পায়, তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের প্রতিও। পরস্পরের গা আঁচড়ান হল এদের মধ্যে একটি অতি প্রচলিত সামাজিক প্রথা।

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে পর্বতের সুউচ্চ এলাকা পর্যন্ত বাস করে তিন শ্রেণীর ভালুক। শ্লথ ভালুক বাস করে পর্বতের পাদদেশে, কাল ভালুক পছন্দ করে পর্বতের নিম্নাংশের অরণ্য আর লাল ভালুক বাস করে বৃক্ষরেখার ওপরে পর্বতের মুক্ত শৃঙ্গের ওপর। তিনটি ভালুকই যদিও প্রধানত ঘাস খেয়ে থাকে, তাহলেও ওরা হল মাংসাশী, স্থানীয় লোকেরা অন্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে এদের সম্বন্ধেই সজাগ থাকে সবচেয়ে বেশি। শ্লথ ভালুকের দেখা ও শোনার ক্ষমতা কম বলে হঠাৎ মানুষের সামনাসামনি এসে পড়লে হয়ত স্রেফ আত্মরক্ষার তাগিদেই ও আক্রমণ করে বসবে।

কাল ও লাল ভালুক সারা শীতকালটা পাহাড়ের গুহা বা গাছের গর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটাবে। এসময় ওদের শারীরব্যবস্থার গতিকে

ওরা এতটাই মন্থর করে ফেলে যে, চার পাঁচ মাস বাদে শীত-নিদ্রা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওদের দেহকে এতটুকু শীর্ণ হতে দেখা যায় না। ওরা কিন্তু এই শীত নিদ্রার আশ্রয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য নেয় না। শীতকালে খাদ্যের অপ্রতুলতা থাকে বিশেষ ভাবেই, তাই শরীরের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনকে কমাবার তাগিদেই এই কৃচ্ছ্র সাধনের ব্রত।

ইয়েতি

ইয়েতি বা তুষার-মানব সম্বন্ধে নানা ধরণের অলৌকিক বা আজগুবি ধারণা চালু আছে। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই অবশ্য ইয়েতিরূপী কোন প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। প্রখ্যাত প্রাণীবিদ রবার্ট ফ্লেমিংয়ের মত হল, ব্যাপারটা সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নৃতত্ত্ববিদ সি. এফ. হাইমেনডর্ফ বলেছেন, শেরপাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয় ওরা বেশির ভাগই কোন না কোন সময় ইয়েতিকে দেখেছে। হিমালয়ের পূর্বভাগে মঠ ও মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবি থেকে দু ধরণের ইয়েতির প্রসঙ্গকে পাওয়া যাচ্ছে। একটির সঙ্গে ভালুকের, আর একটির সঙ্গে বিশাল একটি বানরের চেহারার মিল দেখা যায়।

অষ্ট্রিয়ার প্রাণীবিদ আর. এন. ভোজকোউইত্‌জ্‌ সিকিম ও তিব্বতে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছেন। ইয়েতিকে প্রত্যক্ষ করেছে এমন লোকদের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে প্রাণীটি সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পাচ্ছেন, তা হল এই—প্রাণীটির বড় প্রজাতিটি যখন ওর পেছনের দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় তখন ওর দৈর্ঘ্য হয় সাত থেকে সাড়ে সাত ফুটের মত। ওর বাহুগুলো যেমন লম্বা, তেমনি সমস্ত শরীরটা কাল বাদামী চুলে ঢাকা। আগুনকে প্রাণীটির বড় ভয়। ওর বিপুল শারীরিক শক্তি সত্ত্বেও হিমালয়ের সাধারণ মানুষেরা কিন্তু ওকে একটি

নিরীহ প্রাণী বলেই মনে করে এবং তাদের বিশ্বাস আহত না হলে ও কখনই মানুষকে আক্রমণ করবে না।

অনেকের বক্তব্য হল তুষার মানব কথাটাই ভিত্তিহীন। প্রথমত প্রাণীটি মানুষ নয়, দ্বিতীয়ত এ তুষারের এলাকায় বাস করে না। হিমালয়ের সর্বোচ্চ এলাকায় জঙ্গলের বাসিন্দা হল এরা। সারা দিনমান নাকি প্রাণীটি তার বাসস্থানের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে, রাত্রি বেলা সে তার ডেরার বাইরে বেরয়। তুষারের এলাকায় সে কেন পাড়ি জমায়, এর জবাবটা হল—শিলাস্তরের ওপর যে শ্যাওলা জন্মায় তা খেতে ও নাকি পছন্দ করে।

এ জাতীয় বর্ণনাকে একেবারেই কাল্পনিক বলেও ধরে নেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব এবং পশ্চিম ছুনিয়ার পর্বতারোহীরা হিমালয়ের কিছু কিছু জায়গায় এক অজ্ঞাতনামা জানোয়ারের পায়ের ছাপের ছবি তুলেছেন। পর্বতারোহী এরিক শিপটন ১৯৫১ সালে এভারেস্ট অভিযানের সময় ১৮০০০ থেকে ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় মেনলুং হিমবাহের ওপর একটি প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। ছাপের গভীরতা থেকে বোঝা যায় যে প্রাণীটির ওজন হবে প্রায় ২০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। ছাপগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চির মত এবং ছয় ইঞ্চির মত চওড়া। পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল প্রাণীটির পায়ে পাঁচটি আঙ্গুল রয়েছে এবং মানুষের পায়ের গঠনের সঙ্গে তার অনেকটা মিল যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

ইয়েতি সম্বন্ধে আর একটি ধারণা হল এই যে এ হয়ত জাইগাণ্টোপিথেকাসের কোন আত্মীয়—মানুষের পূর্বপুরুষের কাছাকাছি ঐ প্রাণীটি প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে ভারতবর্ষ এবং চীনের দক্ষিণাংশে বাস করত। হয়ত আগুন ব্যবহারকারী এবং হাতিয়ারধারী আরও উন্নত মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জাইগাণ্টোপিথেকাস সুউচ্চ পর্বতের এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সম্ভবত এখনও সেখানে

বাস করে চলেছে। এই ধারণাটির পেছনেও কিন্তু নির্দিষ্ট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

পশ্চিম হিমালয় এবং কারাকোরাম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা কিন্তু কখনও তুষার মানব জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কিছু শোনেও নি বা দেখেও নি। তুষার মানব সম্পর্কিত ধারণাগুলোর পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য আদৌ কোন প্রমাণ না থাকার ফলে ঘটনাটা বিজ্ঞান জগতের কাছে আজও স্বীকৃতি পায় নি।

সাগরের কথা

পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে সাগর ও মহাসাগরের যে বিরাট বিপুল জলরাশি ছড়িয়ে রয়েছে তার অতলান্ত রহস্য যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে সাগরে অভিযান শুরু করেছিল সে— ঈজিয়ান সাগর ছিল সেই অভিযানক্ষেত্র। এরও দশ হাজার অর্থাৎ বর্তমানের প্রায় বিশ হাজার বছর আগে ভেলাজাতীয় কোন বাহনে চেপে সে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পৌঁছেছিল। মিশরের এক রাণী ৩৫০০ বছর আগে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে নতুন দেশের সন্ধানে নৌবহর পাঠিয়েছিলেন। পলিনেশিয়ানদের পূর্বপুরুষেরা বড় বড় নৌকায় চেপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ থেকে হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাদের বর্তমান আস্তানায় পৌঁছেছিল। ফিনিসিয়ানরা জলপথে আফ্রিকা পরিক্রমা করে খ্রীস্ট জন্মাবার প্রায় ৬০০ বছর আগে।

সাগরে অভিযান

৩২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ফ্রান্সের অভিযাত্রী পিথিয়াস একা একটি নৌকায় চেপে ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে এসে হাজির হন। তার উদ্দেশ্য ছিল, উত্তরের কোন্ অঞ্চল থেকে টিন গ্রীস দেশের বাজারে এসে পৌঁছচ্ছে তা জানা। ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়ালে তিনি এই টিনের খনির সন্ধান পেলেন। পিথিয়াস কোন জায়গার সমাক্ষরেখা নির্ণয়ের মোটামুটি একটি সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং সাগরের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে চাঁদের কলা বৃদ্ধিরও একটি সম্পর্ক

খুঁজে পান। সমুদ্রবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন এভাবেই শুরু হল, বলা যায়।

১৪০০ সালে বার্থালোমিউ ডায়াস ও ভাস্কো দ্য গামা সমুদ্রপথে আফ্রিকা পরিক্রমা করেন। ১৫৬৯ সালে ম্যাজেলান জলপথে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই অভিযানের পেছনে অবশ্য স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের প্রতিশ্রুতি ছিল যে 'দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের' আবিষ্কার হলে সেখানকার সম্পদের একটি অংশ লভ্যাংশরূপে ম্যাজেলানকে দেয়া হবে।

ক্যাপ্টেন কুক ১৭৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ও কুমেরু মহাদেশ আবিষ্কার করলেন। নাবিকদের স্কার্ভি রোগের মূলে যে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং সাগরে কোন অঞ্চলের সঠিক দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য ক্রোনোমিটার যন্ত্রের ব্যবহার কুকেরই আবিষ্কার।

যদিও হাজার হাজার বছর ধরে বাণিজ্য, নতুন দেশ আবিষ্কার ও দখল করা এবং যুদ্ধের আয়োজন সমুদ্রবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছিল, বেশির ভাগ আবিষ্কৃত তথ্যকেই কিন্তু গোপন রাখা হত। প্রাচীন কার্থেজের নাবিকদের সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে সাগরে দূর দেশে পাড়ি জমাবার সবচেয়ে সুবিধাজনক পথের সন্ধান কাউকে জানালে শিরশ্ছেদ করা হবে। ষোড়শ শতকের স্পেনের শাসকেরা উপসাগরীয় স্রোত এবং উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের অস্তিত্বের কথা তাদের নাবিকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন কিন্তু তা প্রকাশ করেন নি।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের গতিপথ সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করেন এবং মহাদেশেরা যে গতিশীল অর্থাৎ মহাসাগরের ওপর ভেসে বেড়ায়, এটা তিনিই প্রথম বলেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত বিগ্‌ল জাহাজে চড়ে চার্লস ডারউইনের ঐতিহাসিক পৃথিবী পরিক্রমা প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করল। উনিশ শতকের শেষভাগে সমুদ্রবৈজ্ঞানিক জাহাজ চ্যালেঞ্জার কর্তৃক সংগৃহীত অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের জলের তাপমাত্রার তথ্য

থেকে জানা গেল, সাগরের তলদেশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক বিশাল পর্বতশ্রেণী মহাসাগরটিকে সমান দুভাগে ভাগ করেছে।

এ যুগের অভিযাত্রী

১৯৩০ সালে প্রাণীবিদ বিবি ও পূর্তবিদ বার্টন ব্যাথিসফিয়ার নামে একটি যন্ত্রে সাগরের গভীরে আধ মাইলের মত নেমেছিলেন। গভীর সমুদ্রের এক বিচিত্র প্রাণীজগতের ছবি এই প্রথম মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হল।

১৯৬০ সালের ২৩শে জানুয়ারী ট্রিয়েস্ট নামে এক বিশেষ ধরণের সামুদ্রিক যানে পিকার্ড ও ওয়ালেস নামে দুজন বিজ্ঞানী সাগরের সবচেয়ে গভীরতম অংশ মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে (১১৫৩০ মিটার গভীর) নেমে এক আশ্চর্য রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। সাগরগর্ভের এই ফাটলটি প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপিনস দ্বীপপুঞ্জের কাছে অবস্থিত এবং সাগরের এই গভীরতম প্রদেশেও প্রাণীজগতের সন্ধান পাওয়া গেল। পর্যবেক্ষণকক্ষের স্বচ্ছ দেয়ালের মধ্য দিয়ে জোরাল সার্চলাইটের আলোতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্রায় এক ফুট লম্বা একটি মাছ ধীরমন্থর গতিতে জলের মধ্য দিয়ে সাঁতরে চলেছে।

অক্সিজেন ছাড়া মানুষ এ পর্যন্ত সাগরের সবচেয়ে যে গভীর অঞ্চলে নামতে পেরেছে, তা হল ৬০ মিটারের মত। জাপানের আমা নামে মেয়ে ডুবুরীরা সাগরগর্ভে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর সন্ধানে এই অসম সাহসিক কাজ এখনো করে থাকে। অক্সিজেনের মুখোশ পরে মানুষ নেমেছে ১০৬ মিটার আর ডুবুরীর পোশাক পরে জাহাজ থেকে প্রাণধারণের রজ্জুর সাহায্যে সে নেমেছে ১৬৫ মিটার।

রূপকথার নায়কের মত সমুদ্রবিজ্ঞানের রাজপুত্র হলেন জ্যাক কুস্তো। সাগরের গভীরে মাছেদের মত স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণের জন্যে ডুবুরীর পোষাকের বদলে কুস্তো উদ্ভাবন করলেন অ্যাকোয়া লাং। আর সমুদ্রের ৩০০ থেকে ৫০০ মিটার অগভীর প্রদেশে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কাজের জন্য তৈরি করলেন ডাইভিং সসার জাতীয় দুজন

আরোহীবাহিত ছোট মাপের বৈজ্ঞানিক যান, খুব সহজেই যাদের পরিচালনা করা যায়। সমুদ্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে কুস্তো হলেন এক অসামান্য নাম।

১৯৫৮ সালে গ্লোমার চ্যালেঞ্জার জাহাজ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ থেকে পলি খননের কাজ শুরু করল। এই কাজ চলে তের বছর ধরে। যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো ছিল খুবই চমকপ্রদ। যেমন, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর নাকি প্রতি বছর এক ইঞ্চি হারে প্রসারিত হচ্ছে; পৃথিবীর কোন মহাসাগর, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাচীনতম তলদেশের শিলা বা পলির বয়স কুড়ি কোটি বছরের বেশি নয় এবং এই সময়কালের মধ্যে সাগরের তলদেশের কোন কোন অংশ কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে—'ভাসমান মহাদেশে'র তত্ত্বের সমর্থন যা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। গত এক কোটি কুড়ি লক্ষ বছরে ভূমধ্য সাগর নাকি একাধিক বার সম্পূর্ণভাবে জলশূন্য ও আবার জলপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অতীতকালের বিভিন্ন তুষার যুগ এবং মধ্যবর্তী উষ্ণ যুগগুলোর আনাগোনার স্পষ্ট পরিচয় সাগরগর্ভের পলি তার বক্ষে ধারণ করে চলেছে।

বিচিত্র তথ্য

১৯৮০ সালের মে মাসে গ্লোমার চ্যালেঞ্জার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের গর্ভে সাত কোটি বছরের প্রাচীন এক পর্বতের দেহ থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহ করল, যার পরীক্ষায় এক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেল। আজ থেকে প্রায় ৬৫ কোটি বছর আগে ক্রিটাসিয়াস ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষের দিকে সাগরের পৃষ্ঠভাগে বসবাসকারী প্রাণীজগত সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। একই সময় জমিতে বসবাসকারী বিশাল সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ডাইনোসরকুলও রহস্যজনকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাগরের পৃষ্ঠ-ভাগে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আবার আবির্ভাব ঘটতে বহু

লক্ষ বছর সময় লেগেছিল।

এই ঘটনার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন যে প্রায় সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর জমির ওপর দশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিশাল গ্রহাণু অথবা ধূমকেতু আছড়ে পড়ে। এই সংঘাতে পৃথিবী থেকে বিপুল পরিমাণে ধূলো ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে যায় এবং সূর্যের আলোকে আড়াল করে ধরে। সূর্যের আলোর অভাবে পৃথিবীর জমি ও সাগরের বুকে উদ্ভিদেরা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই সব উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে স্থলে ও জলে যে সব প্রাণীরা বেঁচে ছিল, যেমন মাটির ডাইনোসরেরা —তারা সবাই নির্মূল হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য অন্য মতও রয়েছে।

সমুদ্রবিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মহাসাগর বহুবার মহাদেশের জমির ওপর অভিযান চালিয়েছে। কুড়ি কোটি বছর আগে ক্রিটাসিয়াস যুগে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মহাসাগরের এক বিপুল বন্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে সমগ্র ইংল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপ, রাশিয়ার মধ্য ভাগ থেকে এশিয়ার দক্ষিণ ভাগ, আমাদের ভারতবর্ষের বেশির ভাগ অঞ্চল, সমগ্র জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং সাহারা মরুভূমি সমেত আফ্রিকার অনেকখানি অংশ সাগরগর্ভে তলিয়ে যায়।

সাগরের জলে 'রেডিও কার্বন ডেটিং' বা তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে জানা গেল, আজ থেকে মাত্র দু'হাজার বছর আগে সাগরের জল নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে পনের মিটার উঁচু হয়ে উঠেছিল। তার ফলে উপকূলবর্তী মানব সভ্যতার প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রই সাগরের বন্যায় ভেসে যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে বিরাট বন্যার কথা লেখা হয়েছে, তা সম্ভবত এই একই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করছে। উত্তর সাগরের মাঝামাঝি জায়গায় তলদেশ থেকে জমিতে বসবাসকারী জীবজন্তুর হাড় ও মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া গেছে। এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, আজকের মাছ ধরার ঐ

বড় জায়গাটিতে (যার নাম ডগার ব্যাঙ্ক) একদিন মানুষের পূর্ব-পুরুষদের বসতি ছিল।

সাগরের সৃষ্টি

সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে বিরাট মহাসাগরগুলো, ওদের সৃষ্টি সম্বন্ধে গোটাকয়েক মত চালু আছে। একটি মত অনুযায়ী গঠনপর্বের গোড়ার যুগে পৃথিবী যখন খুবই তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন সেই তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বিপুল পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে গিয়ে এক বিরাট বায়ুমণ্ডল তৈরি করে। তপ্ত ভূপৃষ্ঠ যখন একদিন শীতল হল তখন জলকণাদের ঘনীভবনের ফলে ঐ বায়ুমণ্ডল থেকে শুরু হল অঝোরধারে বৃষ্টি এবং মহাসাগরের শূন্য আধারগুলো (যারা আগেই গড়ে উঠেছিল) জলে জলে ভরে উঠল। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর সাগরগুলো বর্তমানের চেহারায় পৌঁছেছে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

সাগরের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর একটি মতের গোড়ার কথা শুরু হচ্ছে পৃথিবীর উৎপত্তির সময় থেকে। আনুমানিক ৪৫০ কোটি বছর আগে মহাকাশে এক বিরাট ধুলো আর গ্যাসের মেঘের মধ্যে ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ভর যত বাড়ছিল, ওর অভিকর্ষও সেই অনুপাতে বেড়ে চলে। অভিকর্ষের প্রভাবে পৃথিবীর দেহে সঙ্কোচন ঘটতে শুরু করল এবং তাপের প্রভাবে ভেতর থেকে জলীয় বাষ্প ও অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন গ্যাস বেরিয়ে এসে পৃথিবীর প্রথম যুগের বায়ুমণ্ডলকে গড়ে তুলল। পৃথিবীর তপ্ত পৃষ্ঠ শীতল হবার পর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শুরু হল অঝোরধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি চলেছিল বহু শতাব্দী ধরে, যার ফলে সাগরগুলোর শূন্য আধার ভরে উঠল। বিশেষজ্ঞদের মতে আনুমানিক ৩০০ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে আজকের সাগরগুলো গড়ে ওঠে।

সাগরের খনিজ

সাগরের জলে যত খনিজ পদার্থ আছে, তার ৩/৪ ভাগ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সাগরের জল কিন্তু এতটা লবণাক্ত ছিল না। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সমস্ত নদী মহাদেশের জমি থেকে লবণকে এনে জড়ো করেছে সাগরে। সাগরের জলে অন্য যে সব খনিজ রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, জিঙ্ক, সীসে, সোনা ও রূপো। সাগরের জলে মিশ্রিত অবস্থায় যেসব গ্যাসীয় উপাদান রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড।

সাগরের উপকূলেই কিন্তু মহাদেশের জমির শেষ নয়, জলের ভেতর দিয়ে তা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নেমে গেছে সাগরের গভীর প্রদেশের দিকে। সাগরের জলের নিচে মহাদেশের এই অংশের নাম হল মহীসোপান। এর বেশির ভাগ অংশেই জলের গভীরতা ১৮০ মিটারেরও কম। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মহীসোপানের শিলাস্তরে ভূবিদরা খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছেন এবং নতুন সঞ্চয়ের অনুসন্ধানও চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাগরের মহীসোপান অঞ্চলের গভীরতা প্রতি কিলোমিটারে প্রায় চার মিটার এই হারে বেড়ে চলে। এই বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে ওঠে মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে। প্রতি কিলোমিটারে ত্রিশ থেকে ষাট মিটার করে গভীরতা বেড়ে মহাদেশের ঢাল গিয়ে পৌঁছয় মহাসাগরের গভীরতম তলদেশে। সাগরপৃষ্ঠের ৩০০ মিটার নিচেই সূর্যের আলো ও তাপ আর পৌঁছয় না। কাজেই কোন উদ্ভিদ আলোকবিহীন মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে জন্মায় না। এ এক অসীম অন্ধকারের রাজত্ব। পৃথিবীর সাগরের তলদেশের গড়পড়তা গভীরতা প্রায় চার কিলোমিটার।

সাগরের পর্বত ও স্রোত

পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রের তলা দিয়ে ৬৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটানা এক পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে। কোথাও কোথাও এই পর্বত সাগরের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নানা দ্বীপ গড়ে তুলেছে। যেমন— ক্যানেরিস, অ্যাজোর্‌স্‌, হাওয়াই, কুরাইল, জাপান, ফিলিপিনস প্রভৃতি। মহাদেশের পর্বতগুলো যেমন বাতাস ও বৃষ্টির জলে প্রতিনিয়ত ক্ষয় পেয়ে চলেছে, সাগরের পর্বতেরা কিন্তু সে ঝামেলা থেকে একেবারেই মুক্ত। এই সব পর্বতের আশেপাশে বিরাট গভীর ফাটল এবং ট্রেঞ্চ বা গর্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যে জায়গাগুলোয় ভূগর্ভের অস্থির, অশান্ত রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। পৃথিবীতে যত মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটে ওরা তৈরি হয় এসব জায়গা থেকেই। সমুদ্রগর্ভে হঠাৎ আন্দোলনের ফলে যে সব সামুদ্রিক ঝড় বা ৎসুনামির সৃষ্টি, ওদের তৈরির কারখানাটিও এখানেই এবং এদের কাছাকাছি বহু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্য দগারও বর্তমান যুগেই ঘটেছে। ওদের বেশির ভাগই অবশ্য আমাদের অগোচরেই থেকে যায়।

সাগরের আর একটি রহস্য হল তার স্রোতগুলো। এই সামুদ্রিক স্রোতগুলোর মধ্যে যে বিপুল জলরাশি ছুটতে থাকে, তার পাশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদীগুলোকেও মনে হবে শীর্ণ নালার মত। গালফ্‌ ষ্ট্রীম বা উপসাগরীয় স্রোতটির মধ্যে আমাদের গঙ্গার তুলনায় প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি জল বয়ে চলেছে। এই স্রোতগুলোর যেন ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। যুগ যুগ ধরে একই পথ ধরে ওরা ছুটছে। পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চল পর্যন্ত পাড়ি জমিয়ে সারা পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যে একটি সমতাকে রক্ষা করে চলেছে এই সামুদ্রিক স্রোতগুলো।

সাগরের বিচিত্র প্রাণী ডলফিন

সাগরের জলে কি অফুরন্ত প্রাণের ঐশ্বর্য। কত রকমের মাছ, বিচিত্র তাদের দৈহিক গঠন। সাগরের আরও কয়েকটি বিচিত্র প্রাণী

হল তিমি, ডলফিন, সীল, ওয়ালরাস প্রভৃতি। এরা সবাই স্তন্যপায়ী প্রাণী—আমাদেরই সগোত্র। তিমি, পরপজ ও ডলফিন, এরা হল সিটাসিয়া প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষের পরেই হল এদের স্থান। এদের আদি পূর্বপুরুষেরা একদিন মাটিতেই বাস করত এবং চেহারার মাপেও তারা ছিল খুবই ছোট। তারপর একদিন ওরা ফিরে গেল জলে।

তিমি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত প্রাণীরা হল পরপজ ও ডলফিনেরা। ডলফিনদের সম্বন্ধেই আমাদের আগ্রহটা সবচেয়ে বেশি। এদের শরীর ও মগজের ওজনের পারস্পরিক অনুপাত প্রায় মানুষেরই কাছাকাছি, অবশ্য তার ফলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছন ঠিক হবে না যে ওদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ মানুষেরই মত। তবে মানুষের কিছু কিছু বৃত্তির প্রকাশ এদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়।

ডলফিনদের বৈশিষ্ট্য হল, একটি বিষয় নিয়ে ওরা ভাবতে পারে, সেই ভাবনাকে ওরা কাজে রূপও দিতে পারে এবং একটি কাজ করতে করতে তার ধারাটাকে পরিবর্তনও করতে পারে। এটা হয়ত বেশি নৈপুণ্যকে প্রকাশ করা বা স্রেফ কৌতুকের জন্যও সে করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে ডলফিনের শেখার ক্ষমতা বেশি। খেলা তারা খুবই পছন্দ করে এবং একই খেলা বা কাজ যদি তাদের বার বার করতে বলা হয়, তাহলে তারা বিরক্তি প্রকাশ করে।

ডলফিনদের পরস্পরের মধ্যে অসাধারণ সম্প্রীতির ভাব দেখা যায়। ওদের মধ্যে কেউ যদি কোন কারণে আহত হয় বা বিপদে পড়ে তাহলে অন্য সবাই ওর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ওকে ঠেলে তুলবে জলের ওপরে যাতে ওর ব্লো-হোল বা শ্বাসনালীটি থাকে জলের ওপরে, তা না হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়তে পারে। বাচ্চাদের রক্ষার ব্যাপারে ওরা খুবই সতর্ক। জন্মাবার পর একটি ডলফিন-মা তার বাচ্চাকে প্রথম দু সপ্তাহ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ায় এবং কয়েক সপ্তাহ নিজের কাছাকাছি রাখে।

প্রাচীন কালেও ডলফিন সম্বন্ধে মানুষের প্রীতির নানা উল্লেখ

পাওয়া যায়। প্লুটার্ক বলছেন, 'মানুষের সঙ্গে ডলফিনদের বন্ধুত্বের পেছনে কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই। মানুষের সঙ্গ বা সাহায্যের তাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবুও তারা সমস্ত মানুষেরই বন্ধু এবং নানাভাবে মানুষের উপকার করে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে, ডলফিনেরা স্নানরত অবস্থায় ডুবন্ত মানুষকে অথবা জলমগ্ন নৌকার আরোহীকে ঠেলে তীরে পৌঁছে দিয়েছে। সাগরের নিচে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে সাহায্যকারীর ভূমিকায় বিজ্ঞানীরা ডলফিনকে শিক্ষিত করে তুলছেন। দেহের মধ্যে অবস্থিত সোনার **(Sonar)** ব্যবস্থার সাহায্যে উচ্চ কম্পনশীল শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে তার প্রতিফলন থেকে ডলফিন জলে যে কোন বাধার অস্তিত্ব ও দূরত্বকে নিরূপণ করতে পারে। জলের মধ্যে কোন মানুষ যদি পথভ্রান্তও হয়ে পড়ে, তাহলে শিক্ষিত ডলফিন তার রক্ষাকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করবে।

মানুষ সাধারণত ডলফিনের তেলের লোভে এখনও বহু দেশে এই নিরীহ প্রাণীটিকে শিকার করে থাকে, কিন্তু এরকম একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যাবে না যে ডলফিন নিছক আত্মরক্ষার খাতিরেও কখনও মানুষকে আক্রমণ করেছে।

সাগরের তিমি

পৃথিবীর সুবৃহৎ প্রাণী হল তিমিরা। স্পার্ম তিমির দৈর্ঘ হল প্রায় ষাট ফুট আর নীল তিমির দৈর্ঘ্য হল একশ ফুট এবং ওজন একশ টনের মত। এরাই হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী, যাদের এক একটির ওজন প্রায় পঁচিশটি হাতির সমান। কোন স্থলচর প্রাণীর পক্ষেই আকারে এত বিশাল হওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ শরীরের ওজনের চাপেই তার প্রত্যঙ্গগুলো গুঁড়িয়ে যাবে। সাগরের জলে প্লবতার জন্য ওজনের অনুভূতি অনেক কমে যায়।

একটি নীল তিমির বাচ্চা যখন জন্মায় তখনই তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২৩ ফুটের মত এবং ওজন সাত টনের কাছাকাছি। প্রচুর স্নেহজাতীয়

পদার্থযুক্ত মায়ের দুধ খেয়ে বাচ্চাটার দৈর্ঘ্য দিনে প্রায় দেড় ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় দুশ পাউণ্ডের মত বাড়তে থাকে। সাত আট মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খায় বাচ্চাটা।

তিমিদের সমাজ জীবন খুবই উন্নত। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে এরা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা হাম্পব্যাক বা কুজপৃষ্ঠ তিমির গান পর্যন্ত রেকর্ড করেছেন।

সাগর দূষণ

কল কারখানা থেকে যে বিভিন্ন শিল্পজাত এবং নাগরিক জীবনের ব্যবহার্য উচ্ছিষ্ট নদীগুলোতে ফেলা হয়, তা শেষ পর্যন্ত গিয়ে জমা হয় সাগরে। সাগরের তীরবর্তী জনপদগুলোর যাবতীয় আবর্জনাও ফেলা হয় সাগরে। শিল্পজাত উচ্ছিষ্টের মধ্যে রয়েছে পারদ, সীসে আরসেনিক প্রভৃতি। এরা সাগরের স্রোতগুলোর ঘাড়ে চেপে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সাগর দূষণের সবচেয়ে ক্ষতিকারক উপাদান হল কৃষিক্ষেত্র থেকে নদীর জলে ধুয়ে আসা ডি ডি টি জাতীয় কীটনাশক বস্তুগুলো ; এরা সাগরের অতি ক্ষুদ্র ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনরূপী উদ্ভিদ জগতের বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত করে তেমনি ওদের সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিনথিসিসের ক্ষমতাকেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে দেয়। পৃথিবীর প্রাণীজগতের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ তৈরি করে সাগরের ক্ষুদ্র উদ্ভিদেরা এই সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে। অক্সিজেন তৈরির এই কারখানার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ আমরা ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে ফেলেছি, একই সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলছি। আমাদের সাগরের জলরাশি যদি একবার পুরোপুরি দূষিত হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে পরিশোধিত করার কোন উপায় কিন্তু আমাদের জানা নেই। এ কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে।

ভারতে সামুদ্রিক গবেষণা

দীর্ঘকাল ভারত মহাসাগর ছিল পৃথিবীর একটি বিরাট রহস্যাবৃত অঞ্চল। ১৯৬১ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের কার্যক্রম শুরু হয়, যার অন্যতম কর্মসূচী ছিল ভারত মহাসাগরে প্রাণীজ সম্পদের একটি আনুমানিক পরিমাণ নির্ণয় করা এবং মাছেদের উৎপাদন কিভাবে বাড়ান যায় সে সম্বন্ধে সম্ভাব্য উপায়ও নির্ধারণ করা। ভারতের উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রধান দেশরূপে স্বভাবতই এই মহাসাগরের গবেষণা পর্বের প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে ভারতও যুক্ত হয়ে পড়ে।

ভারতের সমগ্র উপকূলভাগ থেকে সারা বছরে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয়, তার দুই তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয় পশ্চিম উপকূল থেকে। আরব সাগর অঞ্চলে সাগরের তলদেশ থেকে পুষ্টিকর পদার্থবাহিত উর্ধ্বমুখী জলস্রোত সমুদ্র পৃষ্ঠে এসে পৌঁছবার ফলেই এটা ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দেখা গেল, আরব সাগরের উপকূলভাগে বঙ্গোপসাগরের তুলনায় জলে ফসফেটের পরিমাণ প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিদরা ওয়ালটেয়ারের উপকূলের কাছাকাছিও একটি উর্ধ্বমুখী জলস্রোতের সন্ধান পেয়েছেন।

সাগরে প্রোটিন খাদ্য

সাগর থেকে মাছ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে বিজ্ঞানীরা জমিতে কৃষিকাজের উপযোগী পদ্ধতিগুলোকে এখানেও কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন। যেমন, অঞ্চল বিশেষে সার ব্যবহার করা ও তাকে আগাছা থেকে মুক্ত রাখা, পরগাছারূপী প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং এলাকা বিশেষে নির্দিষ্ট জাতের মাছেদের উৎপাদনকে বাড়ান।

সাগরে মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্ররূপে উর্বর ও অনুর্বর এই দু-জাতের এলাকাই রয়েছে। উর্বর অঞ্চলগুলো সামুদ্রিক তৃণে পূর্ণ

থাকে। এই তৃণভূমি ফাইটোপ্ল্যাংকটন নামে এক ধরণের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি। ফটোপ্ল্যাংকটন নামে এক জাতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আবার এই উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। ফটোপ্ল্যাংকটনেরা হল আবার মাছের খাদ্য। সাগরের কোথাও ফাইটোপ্ল্যাংকটনের অভাব ঘটলে সে এলাকা অনুর্বর বলে চিহ্নিত হবে! মাছের কোন সন্ধান সেখানে পাওয়া যাবে না।

ফাইটোপ্ল্যাংকটনের বংশবৃদ্ধি ঘটে সাগরের সেই অঞ্চলে যেখানে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ফসফেট ও নাইট্রেটরূপী পুষ্টিকর পদার্থবাহিত জলস্রোত সমুদ্রপৃষ্ঠে এসে পৌঁছচ্ছে। এই উর্ধ্বগামী জলস্রোতের ব্যাপারটা ফসল ফলানর জন্যে জমি কর্ষণের মত একটি ঘটনা। সাগরের তলদেশ থেকে পুষ্টি উপাদানগুলোকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ওপরে তুলে নিয়ে এসে মাছেদের পক্ষে অনুর্বর এলাকাগুলোকে আবার উর্বর করে তোলার কথাও ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। সাগরের তলদেশে যদি একটি পারমাণবিক রিঅ্যাকটরকে বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে রিঅ্যাকটর নিঃসৃত তাপে চারপাশের জল তপ্ত হয়ে হবে উর্ধ্বগামী এবং সাররূপী পুষ্টি উপাদানগুলোকেও এনে হাজির করবে সাগর পৃষ্ঠে। উদ্ভিদভোজী ফটোপ্ল্যাংকটন এবং ফটোপ্ল্যাংকটনভোজী মাছেদের এক চারণভূমিতে পরিণত হবে জায়গাগুলো।

ভারতেরমালাবার উপকূলে সমুদ্রের প্রতি একর পরিমাণ এলাকায় ৯০০ পাউণ্ড মাছ উৎপন্ন হয়। কোচিন উপকূলে এর পরিমাণ হচ্ছে ১৫০০ পাউণ্ড। ভারতের উপকূলভাগে অগভীর জলে মৎস্য চাষের ক্ষেত্র তৈরি করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। সম্প্রতিকালে জাপানী বিজ্ঞানীদের এক অভিনব আবিষ্কার এ ব্যাপারে এক নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। তারা দেখেছিলেন যে, সাগরের অগভীর জলে ভূমিকম্পের ফলে কোন জায়গা ধসে গিয়ে ধ্বংসস্তূপ তৈরি হলে তা বিপুল পরিমাণে ফটোপ্ল্যাংকটনকে আকৃষ্ট করে। ফটোপ্ল্যাংকটন-ভোজী মাছেরাও স্বভাবতই সেখানে জড়ো হবে। পুরনো গাড়ি

এবং যন্ত্রাদিকে মরচের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে সাগরের তলদেশে বিভিন্ন জায়গায় মজুত করে কৃত্রিমভাবে মাছেদের চাষের ক্ষেত্র এভাবে তৈরি করা সম্ভবপর।

ভারতের সমুদ্রগবেষক জাহাজ কঞ্চ কেরালার উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে বিপুল পরিমাণে কাঁকড়া ও গলদা চিংড়ির সন্ধান পায়। ভারতের সমগ্র উপকূল ভাগ থেকে বর্তমানে মাছের মোট সংগ্রহের পরিমাণ হল বার্ষিক গড়ে ৩০ লক্ষ টন। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী এই সংগ্রহের পরিমাণ আটগুণ বাড়ালেও মাছের প্রজননের ক্ষেত্রে কোন বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই। ভারতের প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা এর ফলে অনেকখানি মিটবে।

সাগরের খনিজ সম্পদ

ভারতের মহীসোপান ও মহাদেশের ঢাল অঞ্চলের পরিমাণ হল ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কাছাকাছি। এই অঞ্চলে ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট এবং গারনেট জাতীয় ভারী খনিজ পদার্থ, ফসফোরাইট, ব্যারিয়াম, সিমেন্ট তৈরির কাজের উপযোগী চুণা-পাথরের বালুকা এবং কাদার অস্তিত্বের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। কেরালার উপকূলে কৃষ্ণ বালুকার যথেষ্ট সঞ্চয় রয়েছে। নদী যে পলি বহন করে নিয়ে এসে সাগরে ফেলে, তাই উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার স্তূপরূপে জমা হতে থাকে। এই কৃষ্ণ বালুকা স্তূপের কিছু কিছু নমুনার মধ্যে মোনাজাইট, ইলমেনাইট এবং জারকন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, যাদের নানা ধরণের অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে।

কেরালার কুইলনের উপকূলের কাছে কৃষ্ণ বালুকার সঞ্চয়ের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন ইলমেনাইট, ১০ লক্ষ টন রিউটাইল, ১২ লক্ষ টন জারকন এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার টন মোনাজাইট রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ভারতের উপকূলভাগে জৈবিক খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে

শামুক, প্রবাল, চুনাপাথর প্রভৃতি। কেরালার উপকূলভাগেই ১৭ থেকে ২৫ লক্ষ টনের মত চুনাপাথরের সঞ্চয় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের লেগুনগুলোতে প্রায় ২০০ কোটি টনের মত চুনাপাথরের কাদা এবং বালুকার স্তূপ রয়েছে। ভারতের পূর্ব উপকূলের মহীসোপান অঞ্চলেও শতকরা ৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ পলির সন্ধান পাওয়া গেছে।

উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপকূলের কাছে ফসফেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের সন্ধান ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমুদ্রগবেষক জাহাজ ভিতিয়াজ বঙ্গোপ-সাগরের গভীর প্রদেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ সংগ্রহ করেছিল। সাগরের গভীরে খনিজ সম্পদ সংগ্রহের কাজ ব্যয়বহুল, তবে অর্থনৈতিক বিচারে যুক্তিযুক্ত হলে সে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতেই হবে।

ভারতের তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত মহীসোপান অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তেলের সঞ্চয় রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ১৯৭৬ সালের ২০ মার্চ ক্যাম্বে উপসাগরে উপকূলের অনতিদূরে আলিয়াবেত (পশ্চিম) তৈলকূপে সর্বপ্রথম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্যাম্বের যে পলল অববাহিকায় তেল আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা সাগরের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৬৪-৬৬ সালে অ্যাকাডেমিক আর্খানগেলস্কি নামক সোভিয়েত গবেষক জাহাজে যে ভূকম্পন সংক্রান্ত জরিপের কাজ পরিচালিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত তদন্ত থেকেও একথা সমর্থিত হয়েছে। এই জরিপের সময় অনেক-গুলো সম্ভাবনাপূর্ণ বড় তেলের কাঠাম ঐ এলাকার মহীসোপান অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়। এগুলির মধ্যে একটি ছিল বম্বে হাই সেন্টি, যা প্রায় ১২০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তেলের কাঠাম বলে একে অনুমান করা হচ্ছে। করমণ্ডল উপ-কূলে, কারিকল ও কচ্ছের উপকূল অঞ্চলে এবং পক প্রণালীতে যে সব জরিপ করান হয়েছিল, তা থেকেও একথা বোঝা গিয়েছে যে

এখানে ভূখণ্ড থেকে সাগরের অভ্যন্তরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এ জাতীয় কাঠাম রয়েছে।

বম্বে হাই সেন্টি থেকে খনিজ তেল সংগ্রহের কাজ বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই তার পরিমাণও বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানের সময় মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি, সমুদ্রগর্ভ থেকে তাপের প্রবহন প্রভৃতি বিষয়ে বহু অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত হয়েছে, মেঘলোকের আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে ও সাগরের তলাবর্তের বিস্তৃত মানচিত্রও রচিত হয়েছে। এই মহান আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার বেশ কিছু সুফল আমরা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি।

পৃথিবীর মহাদেশগুলো কি চলমান ?

বছর পনের আগেও কেউ যদি এমন কথা বলতেন যে মহাদেশ-গুলো ক্রমেই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাহলে কথাটা সাধারণভাবে কেউ বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ। মহাদেশ-গুলোর আবার পা গজাবে কেমন করে? কিন্তু বর্তমানে ধারণাটির সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এত বেশি পরিমাণে যে তত্ত্বটির বিরুদ্ধাচরণ করা আর সম্ভবপর নয়। ধারণাটির সূত্রপাত আদৌ কিভাবে হল, সে কথা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

১৮২৩ সালে ইংরেজ ভূগোলবিশারদ এডওয়ার্ড স্যাবাইন গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের কাছে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কার করার পর তার ভৌগোলিক অবস্থানকে নির্ণয় করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে আর একদল বিশেষজ্ঞ দ্বীপটির অবস্থান নতুন করে নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখলেন, স্যাবাইন দ্বীপটিকে যে জায়গায় আবিষ্কার করেছিলেন, বর্তমানে সেটি সেখান থেকে প্রায় ৪২০ মিটার পশ্চিম দিকে সরে বসে আছে। হঠাৎ এমনটি হবার কারণ কি হতে পারে, তা ভাবতে গিয়ে সবাই বিস্মিত হলেন।

৪০ বছর বাদে ১৯১০ সাল নাগাদ একজন তরুণ জার্মান বিশেষজ্ঞ অ্যালফ্রেড ভেগ্‌নার নতুন করে ঐ একই পরীক্ষার কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, দ্বীপটি ১৮৬৯ সালের পরিমাপ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে সরে গেছে। ভেগ্‌নার প্রথমে ভেবে-ছিলেন, পরিমাপের মধ্যেই কোন গলদ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝলেন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, দ্বীপটিই আসলে তার অবস্থানকে পরিবর্তন করেছে।

ভেগনার এখানেই থেমে থাকলেন না; উত্তর মেরু অঞ্চলের আরও কতগুলো দ্বীপের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে ওদের পুরোন অবস্থানকে মেলাতে গিয়ে তিনি দেখলেন, ওরা সবাই পশ্চিম দিকে বিভিন্ন গতিতে ভেসে চলেছে। গ্রীনল্যাণ্ড পশ্চিম দিকে ভেসে চলেছে বছরে প্রায় চার মিটার বেগে। অ্যামেরিকাও দাঁড়িয়ে নেই —তার গতিও পশ্চিম দিকে। প্রতি বছর ফ্রান্সের শেরবুর্গ এবং অ্যামেরিকার নিউইয়র্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে এক কিলোমিটার— এই হারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে অ্যামেরিকান সৈনিকেরা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি জমিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের তুলনায় ১০ মিটারের মত বেশি সাগরপথ তাদের পাড়ি জমাতে হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেল, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের ওপর প্রতিটি জায়গাই ওদের ভৌগোলিক অবস্থানকে পরিবর্তন করে চলেছে। প্রাচীন মিশরের যে স্থপতিরা সিঅপ্‌সের পিরামিডটি তৈরি করেছিলেন, সেই কীর্তিটি তাঁদের আজ দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। কারণ গত কয়েক হাজার বছরে পিরামিডটি ওর আসল জায়গা থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে সরে বসে আছে। জিব্রালটার প্রণালী যে যুগে 'পিলারস্ অব্ হারকিউলিস' নামে পরিচিত ছিল, সে সময়কার তুলনায় ওর বিস্তৃতি প্রায় তিনগুণ বেড়ে বসে আছে। রোম নগর অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে নিরক্ষরেখার দিকে। উত্তর অ্যামেরিকার গতি হল দক্ষিণাভিমুখী, অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ মেরুর দিকে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেসিয়ার দ্বীপগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

চলমান মহাদেশের তত্ত্ব

মহাদেশগুলোর চলমান পরিস্থিতির ধারণাটি অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ১৬২০ সালে ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, সম্ভবত পশ্চিম

গোলার্ধ, অর্থাৎ দুই অ্যামেরিকা মহাদেশ একদিন ইয়োরোপ এবং আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ অ্যামেরিকা যদি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসতে পারত, তাহলে একটি জিগ-স পাজ্‌লের মত ইয়োরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে ওরা দিব্যি জুড়ে যেত। এই ব্যাপারটিই ছিল বেকনের ধারণার মূলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক প্রাণি-বিদ্যার অন্যতম জনক জর্জ লুই বাফন এবং উনবিংশ শতাব্দীতে অ্যামেরিকার জ্যোতির্বিদ এডওয়ার্ড পিকারিংও এ জাতীয় ধারণার কথা বলেন। কিন্তু ভেগ্‌নারই হলেন এই 'চলমান মহাদেশ তত্ত্বের' (থিওরি অব্ কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট) আসল স্রষ্টা। কারণ এই তত্ত্বটির যথার্থ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভেগ্‌নারের তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পেল, পৃথিবীর একেবারে পৃষ্ঠভাগের যে অংশ হল ত্বক, তার মধ্যে পাশাপাশি (ল্যাটার‍্যাল্) স্থান পরিবর্তনের ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে। তাঁর মতে আজ থেকে দশ কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক যুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলো একটি মাত্র ভূখণ্ডের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ছিল। এই অতিকায় মহাদেশটির (সুপার কন্টিনেণ্ট) নাম দিয়েছিলেন তিনি প্যানগিয়া। ভেগ্‌নার তাঁর বক্তব্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন বিভিন্ন মহাদেশ থেকে প্রাপ্ত ভূতত্ত্ব ও জীবাশ্ম-বিদ্যার প্রমাণগুলোর ওপর ভিত্তি করে। বর্তমানে অবশ্য একটি নয়, দুটি অতিকায় মহাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নেয়া হচ্ছে—উত্তর গোলার্ধে লরেসিয়া এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

আমরা জানি, পৃথিবীর সমগ্র অভ্যন্তরভাগ কয়েকটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর প্রথম স্তর হল তার ত্বক (ক্রাস্ট্)। মহাদেশের জমি বা পর্বতের নিচে এই ভূত্বক ৩২ থেকে ৪৮ কিলোমিটারের মত পুরু। ভূত্বকের নিচে হল পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান স্তর গুরুমণ্ডল (ম্যাণ্ট্‌ল্)। অতি আধুনিককালের

তত্ত্ব (প্লেট টেক্‌টনিক্‌স) অনুযায়ী পৃথিবীর ত্বক আবার একাধিক বিশাল প্লেটের সমবায়ে তৈরি। এই প্লেটগুলো যখন পরস্পরের গা ঘেঁষে অনুভূমিক (হরাইজন্টালি) বা লম্বভাবে (পারপেনডিকুলারলি) নড়াচড়া করে, তখন ভূতাত্ত্বিক নানা পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গার, কোন নতুন দ্বীপের সৃষ্টি বা পুরোন কোন দ্বীপের সাগরের তলায় তলিয়ে যাওয়া—প্রতিটি ঘটনার মূলে রয়েছে এই প্লেট টেক্‌টনিক্‌সের খেলা। চলমান মহাদেশ তত্ত্বের আধুনিক কালের ব্যাখাতেও ঐ একই তত্ত্ব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

হ্যারল্ড জেফ্রিসের মত ভূবিদ্‌রা, যাঁরা 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বের সঙ্গে একমত নন, তাঁদের বক্তব্য হল, এই মহাদেশগুলোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তা ওদের জোগাচ্ছে কে? এ তো আর জলে কাঠের নৌকো ভাসাবার মত কোন ব্যাপার নয়। গুরু-মণ্ডলে শক্ত কঠিন শিলাস্তরের রাজত্ব। তার ওপর দিয়ে ভূত্বকের এক একটি অংশের চলাফেরার জন্য কোন সুযোগ সুবিধা সে হঠাৎ করে দিতে যাবেই বা কেন? খুব বেশি শক্তি নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে গেলে মহাদেশের জমির তুমড়ে বেঁকে যাবারই কথা।

লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড

ভূতাত্ত্বিক তথ্যের অনুসন্ধান থেকে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রাচীন পৃথিবীর ভূভাগ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে ছিল। উত্তর অ্যামেরিকা, ইয়োরোপ, গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর এশিয়া—এদের মিলিত ভূখণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে লরেসিয়া—ক্যানাডার লরেন্স নদীর নিকটবর্তী অঞ্চল লরেসিয়ান থেকে এই নামকরণ। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, ভূখণ্ডটির মিলিত অবস্থায় অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

দক্ষিণ অ্যামেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া

এবং অ্যাণ্টার্কটিকা—এরা ছিল আর একটি মিলিত ভূখণ্ডের অংশ, যার নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। মধ্য ভারতের পূর্বভাগে গণ্ডোয়ানা নামে একটি ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলের নামানুসারে এই নাম রেখেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অস্ট্রিয়ার ভূবিদ এড়ুয়ার্ড সয়েস। ভারত মহাসাগরের অস্তিত্বও তখন ছিল না। সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল শুধু একটিমাত্র মহাসাগর।

লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড—প্রাচীন পৃথিবীর এই দুটি ভূভাগ অতীতকালের মতই বর্তমানেও একটি সুগভীর ও বিস্তৃত খাদের (ট্রেঞ্চ) দ্বারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই খাদটির শুরু অ্যাণ্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে, তারপর পূবদিকে অ্যাটলাণ্টিক ও ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে এশিয়া মহাদেশের মধ্য দিয়ে হিমালয় পর্যন্ত ওর বিস্তৃতি। ফাটলের দুপাশে এই যে দুটি ভূখণ্ড, এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ওরা নড়াচড়া করে থাকে স্বতন্ত্রভাবে এবং উভয়েরই গতি হল বিষুবরেখার দিকে। পারস্পরিক সংঘর্ষেও এরা জড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং সংঘর্ষের পর প্রতিফলিত হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে আসে। গত পঞ্চাশ কোটি বছরে এই দুটি ভূখণ্ড সংঘর্ষে জড়িয়েছে পাঁচবারের মত।

গত পঁচিশ কোটি বছর ধরে গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডই নাকি ছিল বেশি সক্রিয়। কার্বনিফেরাস বা কয়লা তৈরির যুগ থেকে লরেসিয়া বেশি পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

বর্তমানে এই দুটি ভূখণ্ড এগিয়ে চলেছে পরস্পরের দিকে। দুটি ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী খাদ বরাবর পৃথিবীর ত্বক পেষণের চাপে যাচ্ছে ভেঙ্গে। এ অঞ্চলের আগ্নেয়গিরিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠছে—অগ্ন্যুদ্গারের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তপ্ত গলিত লাভার স্রোত, কোন দ্বীপ যাচ্ছে সাগরগর্ভে তলিয়ে, সাগরগর্ভের কোন ভূমিকম্প থেকে উদ্ভূত বিরাট বিপুল জলোচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী কোন শহরের ঘটছে সাময়িক সলিল সমাধি।

প্রকৃতির তাণ্ডবরূপী এই বিরাট নাটকের সামনে মানুষের

ভূমিকাটা নিতান্তই অসহায়ের মত। ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন পর্বের সুদূর অতীতে যে খেলা হয়েছিল শুরু, সে খেলা শেষ করার জন্য প্রকৃতির কোন তাড়া নেই। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন প্রকৃতির রাজত্বে এই টানাপোড়েনের ফলে এমন কোন বড় রকমের বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই, যাতে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই সামগ্রিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

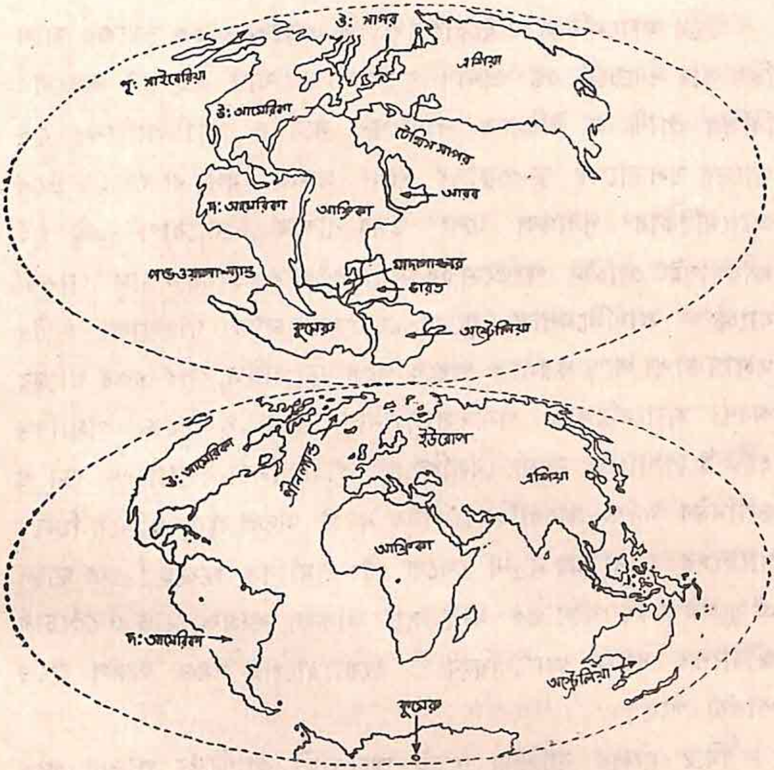
ভাঙ্গনের পরের অধ্যায়

লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ভাঙ্গন বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড দশ কোটি বছর আগে প্রথম ভাঙ্গতে শুরু করে। ভাঙ্গার মূলে কি ধরণের প্রক্রিয়া কাজ করেছিল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নানা মত রয়েছে। প্রধান মতটির বক্তব্য হল, ভূগর্ভ থেকে তপ্ত শিলার এক প্রবাহ (কন্‌ভেকশন কারেন্ট) ওপরের দিকে উঠে এসে সমস্ত স্থলভাগকে একদিন বিপুল বেগে নাড়া দিয়েছিল। ভূত্বক চিড় খেল সেই নাড়ায়। এ জাতীয় ঘটনা অবশ্য নিরবচ্ছিন্নভাবেই ঘটে চলেছে।

আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া এবং কুমেরু মহাদেশ—গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ভাঙ্গনের এই টুকরোগুলো আজ পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে। ওদের পথচলা কিন্তু আজও শেষ হয়নি। ভারতবর্ষ ভূত্বকের যে প্লেটের অংশ, তা এশিয়া মহাদেশের প্লেটের ওপর সংঘাত সৃষ্টি করছে। ভারতবর্ষের প্লেটটি যত এগোচ্ছে সামনের ভূভাগের ওপর তত চাপ সৃষ্টি হবার ফলে বিরাট উঁচু পাহাড়ের আকারে ভূখণ্ড মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। মানচিত্রে ভারতবর্ষকে যত বড় দেখায়, ভারতবর্ষরূপী প্লেটটি আসলে হয়ত তার চেয়ে অনেক বড় এবং প্লেটটির এই নড়াচড়ার ফলেই ভারতবর্ষের পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে মাঝে মাঝে বিরাট ভূমিকম্প মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

লরেসিয়ার ভাঙ্গন শুরু হবার পর অ্যামেরিকা ও ইয়োরোপের

মধ্যেকার ফাটলটা ক্রমেই চওড়া হতে শুরু করল। ফাটলটা চওড়া এবং গভীরতায় প্রতি একশ বছরে হয়ত মাত্র দু-এক মিটার করে বাড়ছিল। দু' টুকরো হয়ে যাওয়া দুটো স্থলভাগের মাঝখানকার ঐ ফাটলটায় মহাসাগরের জল ঢুকে পড়ে দিব্যি একটা খাড়ি বানিয়ে



ভেগনারের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলো একদিন মিলিত অবস্থায় ছিল (ছবির ওপরের অংশ)। সেই পরিস্থিতি থেকে ভেঙ্গে যাবার পর ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বর্তমানের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে (ছবির নীচের অংশ)।

বসল। বিশ থেকে ত্রিশ কোটি বছরের মধ্যে চলমান স্থলভাগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঐ খাড়ি ক্রমে চওড়া হতে হতে আজকের অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মত বিরাট রূপ ধারণ করে বসে আছে। সাগরটির বিস্তারও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

বয়সের বিচারে অ্যাটলান্টিক হল নবীন। প্রশান্ত মহাসাগরকে সে বিচারে প্রাচীনই বলতে হয়। অ্যাটলান্টিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর বিস্তৃতিও ধীরে ধীরে কমে আসার কথা।

তত্ত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ

উত্তর অ্যামেরিকা ও ইয়োরোপ যে একদিন একই ভূখণ্ডের অংশ ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় এই দুই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্মের মধ্যে। অ্যাটলান্টিকের দুই পাড়ের স্থলভাগের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। উত্তর অ্যামেরিকার পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপ—এই দুই জায়গায়ই প্রাচীন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কয়লার স্তরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কার্বনিফেরাস যুগের যে অরণ্যজাত গাছপালা মাটির তলায় চাপা পড়ে কয়লার স্তরকে গড়ে তুলেছিল, সেই একই গাছের অরণ্য অ্যামেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া থেকে পূবদিকে প্রসারিত হয়ে ইয়োরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সাইলেসিয়া, পোল্যাণ্ড, ডন ও ড্যানিউব নদীর অববাহিকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। গাছেদের জীবাশ্মের নমুনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া ঐ যুগের একই প্রজাতির মাকড়সা, কাঁকড়া, শামুক, মাছ ও কেঁচোর জীবাশ্মের সন্ধান অ্যামেরিকা ও ইয়োরোপের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে।

মিঠে জলের বাসিন্দা একই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাওয়া গেছে দক্ষিণ অ্যামেরিকার অ্যামাজন নদী এবং ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত আফ্রিকার কঙ্গো নদীর খাড়িতে।

দক্ষিণ অ্যামেরিকার দক্ষিণাঞ্চল একদিন যে খুব প্রাচীন একটি হিমবাহের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তার প্রমাণ এখনো সেখানে রয়েছে। একই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলেও। হিমবাহের গতির ফলে পাথর কুচিয়ে যে ছোট উপলখণ্ডের সৃষ্টি হয়, দু জায়গাতেই তার ছড়াছড়ি। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে,

দক্ষিণ অ্যামেরিকা একদিন আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল, যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চভূমিতে তৈরি হবার পর কোন হিমবাহ স্থলপথেই ঐ অঞ্চলে পৌঁছতে পেরেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের কাছে পাঞ্চেৎ শিলাস্তরের মধ্যে লিসট্রো-সরাস নামে মেসোজোয়িক যুগের যে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, সেই একই প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে কুমেরু মহাদেশেও। গ্লসপটেরিস ও গদামপটেরিস নামে তুটি ফার্ন গাছের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের মত কুমেরু মহাদেশেও।

এই যে সাদৃশ্যগুলোর সন্ধান আমরা প্রাচীন লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে পাচ্ছি, তা কি শুধু একটি আকস্মিক ঘটনা? এই তুই ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশগুলোর একদিন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণই কি এ থেকে আমরা পাচ্ছি না?

মহাদেশগুলোর চলমান তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে আর একটি পার্থিব ঘটনা থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে যে চুম্বকত্ব সঞ্চিত হয়ে আছে, তার পর্যবেক্ষণ থেকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ইতিহাস নির্ণয় করতে চাইছিলেন পৃথিবীর পদার্থবিদ ও ভূপদার্থবিদরা। লোহাযুক্ত কোন শিলা যখন তৈরি হয়, তখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্থান (উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর) অনুযায়ী শিলাটিও খানিকটা চুম্বক ধর্ম অর্জন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন যুগের শিলাস্তরের মধ্যে সঞ্চিত চুম্বকত্বের পরিমাপের মধ্য দিয়ে একটি আশ্চর্য্য তথ্যের সন্ধান পেলেন বিশেষজ্ঞরা—তা হল এই, অতীতে পৃথিবীর তুই চৌম্বক মেরু বিভিন্ন সময়ে তাদের অবস্থানকে পরিবর্তন করেছে। (নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ ব্ল্যাকেট ও পরবর্তীকালে রানকর্ণ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।) এ থেকে অবশ্য আমরা এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছব যে পৃথিবীর তুই চৌম্বক মেরু আদৌ ওদের স্থান পরিবর্তন করে নি

—যেটা বাস্তবে সম্ভবপরও নয়, বরং মহাদেশগুলোই পৃথিবীর পৃষ্ঠ-ভাগের ওপর ঘুরে বেড়ানর জন্য ওদের শিলাস্তরে সঞ্চিত, চৌম্বক ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের পরিমাপ থেকে কি পরিমাণ ঘোরাঘুরি ওরা অতীতে করেছে তারও একটা হিসেব পাওয়া গেল।

এ কথাটা ভাবতেই কেমন মনে হয় যে আমরা পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ বিভিন্ন প্লেটরূপী ভেলায় চেপে বসে আছি আর এই ভেলাগুলো খুব ধীরগতিতে ভেসে চলেছে। সৌভাগ্যের কথা, এই ভেসে পড়ার পেছনে কোন অজানা লক্ষ্যের হাতছানি অবশ্য নেই। কোথায় কোনদিকে যাচ্ছি, জানা আছে। তা হলেও সমগ্র ঘটনাটির মধ্যে একটা বিস্ময়ের রোমাঞ্চকে অনুভব না করে কিন্তু উপায় নেই।

হিমাবৃত মহাদেশ কুমেরু

কত যুগ ধরে ঘুমিয়েছিল তুষার রাজ্য দক্ষিণ মেরু মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু। কি যেন এক অজানা রহস্যের হাতছানি কত অভিযাত্রীকে টেনে এনেছে এর বুকে। কিছুকাল আগে পর্যন্তও কুমেরু ছিল এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত জগৎ। কোন মানুষের স্থায়ী বসতি ছিল না, সবে গত শতাব্দীতে মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে ওখানে।

এক আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বর্তমানে কুমেরু। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও গত কয়েক বছর ধরে এই অনুসন্ধান কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

কুমেরু অভিযান

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মোটামুটি একটি ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া গেলেও যে অঞ্চলটি সুদীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত এবং রহস্যাবৃত হয়ে ছিল, সে হল অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশ। মানুষের বাসভূমির সমস্ত এলাকাগুলি থেকে তার বিপুল দূরত্বের জন্যই এটা ঘটেছিল। প্রাচীন গ্রীসের মানুষেরা পৃথিবীকে জানত একটি বর্তুলাকৃতি ক্ষেত্ররূপে। তাদের ধারণাটা ছিল এই, উত্তর গোলার্ধের ইয়োরোপ ও এশিয়ার ভূখণ্ডের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দক্ষিণ গোলার্ধেও একটি ভূখণ্ড থাকা দরকার, তা না হলে পৃথিবী আকাশে স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়তে পারে। এরপর প্রায় দু হাজার বছর ধরে ধারণাটা প্রায় চাপা পড়েই ছিল।

১৫২০ সালে ম্যাগেলান যখন দক্ষিণ অ্যামেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার পথ আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি

আরও দক্ষিণে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিদের প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে ঐ অঞ্চলটিকে দক্ষিণ মহাদেশের অংশ বলেই ধরে নিয়েছিলেন। এরপর ১৭৭১ সাল নাগাদ ইংরেজ অভিযাত্রী জেমস কুক ৭১ ডিগ্রি দক্ষিণ সমাক্ষরেখা (নিরক্ষরেখার সমান্তরাল কাল্পনিক রেখা) বরাবর জাহাজে পাড়ি দেবার সময় সামুদ্রিক ঝড় এবং বরফের বড় স্তূপের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনও কুমেরু মহাদেশের উপকূল থেকে তার দূরত্ব ছিল প্রায় ২৪০ কিলোমিটার। তিনি অবশ্য সেটা বুঝতে পারেন নি।

১৮১৯ সালে রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের আনুকূল্যে গটলিব বেলিংহাউসেন সমস্ত কুমেরু মহাদেশকে পরিক্রমা করে ফিরে এলেন, কিন্তু কোথাও নামতে পারেন নি। তিনিই প্রথম কুমেরুর উপকূলভাগ পরিদর্শন করেন এবং ঐসব অঞ্চলের কিছু মূল্যবান মানচিত্রও তৈরি করেছিলেন। ১৮৪১ সালে উত্তর চৌম্বক মেরুর আবিষ্কর্তা জেমস ক্লার্ক রস যখন কুমেরু মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছলেন, একটি বিশাল পর্বতশৃঙ্গ তাঁর চোখে পড়ল। রস পর্বতটির নাম রাখলেন মাউণ্ট এরেবুস। সাগরটির নাম পরে রাখা হয়েছিল রস সমুদ্র। ১৮৯৫ সালে কুমেরুর বুকে প্রথম যে অভিযাত্রীর পদচিহ্ন পড়েছিল, তিনি হলেন নরওয়ের মানুষ, কার্সটেন্‌স্ বর্চগ্রোভ্রিংক।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিযানের নায়ক ছিলেন স্যাক্‌লটন এবং তাঁর লক্ষ্যবস্তু ছিল দক্ষিণ মেরু। ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মহাদেশের বরফাবৃত বুকের ওপর দিয়ে এক অভিযানে তিনি দক্ষিণ মেরুর প্রায় ১৬০ কিলোমিটার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পথকষ্টকে অতিক্রম করে তিনি হয়ত দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবেন, কিন্তু ফেরার সময় সুদীর্ঘ পথ পাড়ি জমাবার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক সামর্থ্য আর হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না। তাই দক্ষিণ মেরুর অত কাছ থেকেও ফিরে আসার সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন।

দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কর্তা আমুণ্ডসেন ১৯০৯ সালে উত্তর মেরুর দিকে অভিযান করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু যেই তিনি খবর পেলেন যে, পিয়ারী উত্তর মেরুতে পৌঁছে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুকেই তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলরূপে নির্বাচন করে বসলেন। পরিকল্পনা তৈরির ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অভিজ্ঞতাও কম নয়। কুমেরু মহাদেশে ইতিপূর্বে একটি শীতকাল তিনি কাটিয়েছেন এবং আর্কটিক বা সুমেরু মহাদেশে তিনটি অভিযান তিনি পরিচালনা করেছেন।

১৯১১ সালের ১৯শে অক্টোবর আমুণ্ডসেন মহাদেশটির দক্ষিণ দিকে 'বে অফ হোয়েলস' বা তিমি উপসাগরের তীরবর্তী ফ্র্যামহাইম কেন্দ্র থেকে তাঁর অভিযান শুরু করলেন। আমুণ্ডসেন জানতেন, রসদপত্র অথবা যানবাহন—যে কোন একটি ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি থাকলেই বিপর্যয়কে ঠেকান যাবে না। তাই দুটিরই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন অপর্যাপ্ত পরিমাণে। চারটি স্লেজগাড়ি টানার কাজে প্রতিটি গাড়ির জন্য তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের ১৩টি হাস্কি কুকুরকে নিযুক্ত করেছিলেন। কুকুরদের ট্রেনিং-এর ব্যাপারটা উত্তর মেরু অভিযানের সময় এস্কিমোদের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন। অভিযানের সমস্ত পথ ধরে তিনি রসদপত্র জমা রাখার জন্যে একটির পর একটি ক্যাম্প তৈরি করতে করতে চললেন।

আমুণ্ডসেনের প্রথম ক্যাম্প থেকে লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব ছিল প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার। তাঁর চারজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি প্রথম ১৬০ কিলোমিটার পাড়ি জমালেন স্লেজগাড়িতে চড়ে, পরের ৪৮০ কিলোমিটার গেলেন স্কি করে—মেরু অভিযানের অর্ধেক পথ পাড়ি জমিয়েও তাঁদের দৈহিক সামর্থ্য তখনও অটুট। এবারে পাহাড়ের চড়াই পথ পেরোতে হবে। পাহাড়ের ওপর পৌঁছে আমুণ্ডসেন ১৮টি সবচেয়ে বলশালী কুকুরকে বাদ দিয়ে আর সবগুলিকেই হত্যা করলেন। দক্ষিণ মেরু থেকে ফেরার সময় পথের খাদ্য হিসেবে সেই মাংস সংরক্ষিত করে রাখা হল।

১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর একটি পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুর ওপর তাঁর স্বদেশ নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করলেন। ফেরার সমস্ত পথটাই তাঁরা নির্বিঘ্নে পার হতে পেরেছিলেন। যাতায়াতে তাঁর মোট সময় লেগেছিল ৯৯ দিন।

আমুণ্ডসেনের মেরু অভিযানের সাফল্যের পাশাপাশি অভিযাত্রী রবার্ট এফ স্কটের অভিযানের করুণ পরিণতি খুবই মর্মান্তিক, তাহলেও অপরিসীম সাহস এবং ধৈর্য্যের এক মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিযান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯১১ সালের ২রা নভেম্বর কুমেরুর উত্তর দিকে ম্যাকমার্ডো সাউণ্ড নামে জায়গাটি থেকে স্কট অভিযান শুরু করলেন। ২৮০০ কিলোমিটারের লম্বা পথ—পথে পড়বে ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বার্ডমোর হিমবাহ এবং ২৪০০ মিটার উঁচু মালভূমি। পথে তুষারের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং পথকষ্ট সবকিছু পেরিয়ে প্রচণ্ড আত্মশক্তির জোরে ১৮ই জানুয়ারি স্কট যখন তাঁর দলের আর চারজন সঙ্গীকে নিয়ে দক্ষিণ মেরুতে এসে পৌঁছলেন, তখন ভগ্নচিত্তে দেখলেন আমুণ্ডসেনের তাঁবু ও নরওয়ের পতাকা।

ক্লান্ত ও ভগ্নচিত্তে স্কট তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে চললেন। যাবার সময়ে তুমাস ধরে তৈরি করা একটির পর একটি রসদের তাঁবু ছুঁয়ে ছুঁয়ে চললেন। ১৯১২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী দলের একজন সদস্য ইভান্সের মৃত্যু ঘটল। তাপমাত্রা ক্রমেই কমছিল। দলের আর একজন সদস্য ওট্‌স্ ফ্রস্ট বাইটের (তুষারের প্রভাবে শরীরের প্রান্তভাগের মাংসপেশী পঙ্গু হয়ে যাওয়া) অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন। ১৭ই মার্চ এক তুষারের ঝড়ের মধ্যে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন।

স্কট সমেত বাকি তিনজন অভিযাত্রী সকলেই ফ্রস্ট-বাইটে আক্রান্ত—পথ চলার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে। ২১শে মার্চ—সঙ্গে আর মাত্র তু-দিনের রেশন রয়েছে, একটি খাদ্যের ডিপো থেকে তাঁদের দূরত্বও আর মাত্র ১৮ কিলোমিটার—এই অবস্থায় কুমেরু মহাদেশের ভয়ঙ্কর শীত নেমে এল। এক সপ্তাহ ধরে তিনটি মানুষ

তাঁবুর মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন। খাবার ফুরিয়ে গেছে। ২৯শে মার্চ স্কটের ডায়েরিতে শেষ লেখা—আর বোধহয় আমরা পেরে উঠব না, আমার লেখার ক্ষমতাও শেষ হয়ে এসেছে।

একটি অনুসন্ধানী দল আট মাস বাদে স্কটের তাঁবু এবং অভিযাত্রীদের তিনটি মৃতদেহ খুঁজে পায়। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রার জন্য দেহগুলির কোন বিকৃতি ঘটেনি। স্কটের ডায়েরিটি মেরু অভিযানের এক অসামান্য দলিল। স্কট এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন বেঁচে থাকার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম করছিলেন, তখনও কিন্তু তাঁরা বয়ে নিয়ে চলেছিলেন ৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের অতি মূল্যবান জীবাশ্ম এবং ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের একটি বোঝা, দক্ষিণ মেরুর দিকে অভিযানের পথে যা তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। এই নিদর্শনগুলি কুমেরু মহাদেশের ঐ অঞ্চলের বয়স ও ইতিহাস নির্ধারণে বিজ্ঞানীদের পরবর্তীকালে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

অথৈ বরফের রাজত্ব

কুমেরু হল আসলে একটি মহাদেশ, বরফের স্তূপের তলায় যার জমির প্রায় সম্পূর্ণ অংশটাই চাপা পড়ে আছে। কুমেরুকে ঘিরে ঝড় ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের জলরাশি, যার বুকে ভেসে বেড়ায় বিশাল আকারের বরফের স্তূপ বা হিমশৈল (আইসবার্গ)। প্রকৃতি যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গের বেড়াজাল তৈরি করে রেখেছেন কুমেরুকে ঘিরে।

অথৈ বরফের রাজত্ব হল কুমেরু। আর্কটিক বা সুমেরু মহাদেশের তুলনায় এখানে বরফের পরিমাণ প্রায় আটগুণ বেশি। যে বরফের স্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে কুমেরু, গড়পড়তা মাপে তা প্রায় দেড় কিলোমিটার পুরু। মরুভূমির সঙ্গে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে কুমেরুর—দুয়েরই বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতি সামান্য। কুমেরুর কেন্দ্রভাগে রয়েছে ৩৯০০০ মিটার উঁচু এক তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ, দক্ষিণ মেরু থেকে যার দূরত্ব হল ৬০০ কিলোমিটারের মত।

যুগের পর যুগ ধরে বরফ জমে জমে যে হিমবাহের (গ্লেসিয়ার)

দল গড়ে উঠেছে কুমেরু মহাদেশ জুড়ে, তারা কি স্থিতাবস্থাশীল অবস্থায় আছে নাকি গলছে—এটাই ছিল বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। তবে ওরা যে চলমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জলের মত সব বরফের স্তূপই চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একটি সমমাত্রায় আসার চেষ্টা করে, তবে ওদের গতিটা থাকে খুবই মন্থর। দক্ষিণ মেরুতে যে তুষারকণাটি আজ ঝরে পড়ল, তা হয়ত আরও অগণিত সঙ্গীদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে কয়েক হাজার বছর বাদে গিয়ে পৌঁছবে সাগরে।

সাগরের দিকে বরফের রাশির এই অবিচ্ছিন্ন অভিযানের ফলে কুমেরুতে এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'ব্যারিয়ার আইস' বা বাধার প্রাচীররূপী বরফের রাশি। সাগরের দরিয়ায় পৌঁছনর পর বরফের বিশাল বিশাল খণ্ড ভেঙ্গে গিয়ে হিমশৈলের রূপে সাগরের বুকের ওপর দিয়ে পাড়ি জমাতে থাকে। এদের এক একটি দৈর্ঘ্যে ৮০ থেকে ১৬০ কিলোমিটারের মত লম্বা এবং প্রস্থে ৩০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। সাগরের পৃষ্ঠভাগের ওপর প্রায় ৭৫ মিটার পর্যন্ত এরা মাথা উঁচিয়ে থাকতে পারে।

দক্ষিণ মেরু জায়গাটির অবস্থান হল প্রায় ২৭৭০ মিটার উঁচু হিমবাহরূপী একটি বরফের স্তূপের ওপর, যার নিচে রয়েছে কুমেরু মহাদেশের শিলাস্তর। উচ্চতার জন্যেই দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত চরমভাবাপন্ন এবং এখানে সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রা দেখা গেছে, তার মাপ হল —৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, উত্তর মেরুর হিমশীতল তাপমাত্রার চেয়েও ১৭ ডিগ্রি কম। সারা বছরই এখানে বাতাসের বেগ হল ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার, তুষার ঝড়ের সময় যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯০ কিলোমিটারে।

কুমেরু মহাদেশ জুড়ে প্রাণের অনুকূল পরিবেশ নেই কোথাও। পৃথিবীর শেষ তুষার যুগের হিমশীতল আলিঙ্গনে সে এখনও আবদ্ধ হয়ে আছে। কুমেরু যে সারা পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে, তা বোঝা যায়, কিন্তু সেটা যে কিভাবে এবং কতটা

পরিমাণে ঘটছে, তা জানা নেই। কুমেরুর বরফের নিচে যে জমি রয়েছে, তার বিস্তৃতি এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এখনও নির্ধারিত হয়নি সঠিকভাবে।

বরফের শেষ নেই

মোটামুটি একটি হিসেব হল, পৃথিবীর মোট তুষার ও বরফের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রয়েছে কুমেরু মহাদেশে। তুষার থেকে বরফে রূপান্তরের পেছনে রয়েছে তুষারের বিভিন্ন স্তরের চাপ, যার প্রভাবে তুষারের কণাগুলির মধ্য থেকে বাতাস সরে গিয়ে বরফের রূপে ওদের ঘনীভবনের কাজকে সহজ করে তোলে।

কুমেরু সম্বন্ধে আমাদের বড় জিজ্ঞাসা, ওখানে এত বরফ এল কোথা থেকে এবং কি ধরণের প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাবে হিমবাহদের অগ্রগতি ঘটে ও আবার তারা পেছিয়ে যায়। সোজা কথায় প্রশ্নটা হল, হিমবাহদের সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে এবং তুষার যুগগুলিই বা কিভাবে ঘটছে?

পৃথিবীর শেষ তুষার যুগের সূচনা হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। কুমেরু মহাদেশের উপরিভাগে এবং পার্বত্য এলাকায় হিমবাহদের অগ্রগতি ২০,০০০ বছর আগে পর্যন্তও চলছিল, কিন্তু তারপর থেকে শুরু হয়েছে ওদের পেছিয়ে যাওয়া—যে ঘটনাটা আজও চলছে। আজ থেকে মাত্র দু হাজার বছর আগেও ক্যানাডা ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলই ছিল মহাদেশ-জাত হিম-বাহের দ্বারা আবৃত। হিমবাহদের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সাগরের পৃষ্ঠভাগের মাত্রার কমা-বাড়ার ঘটনাটাও স্বাভাবিকভাবেই জড়িত। এর প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। আজ থেকে ২০,০০০ বছর আগেও সাগরের পৃষ্ঠভাগের গড় উচ্চতা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ১৭০ মিটার নিচে ছিল। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে এই সময়কালের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়েই বরফের পরিমাণ বিশেষভাবে কমেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে হিমবাহ এবং তুষারের স্তূপের মধ্যে যে পরিমাণ জল বর্তমানে

বরফের আকারে জমে আছে, তা যদি কোন কারণে গলে গিয়ে সমস্ত জল ছাড়া পায়, তাহলে সাগরপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ষাট মিটারের মত বেড়ে উঠবে। সে অবস্থায় পৃথিবীর উপকূলবর্তী ঘন বসতিপূর্ণ এক বিরাট অঞ্চল সাগরের জলের তলায় যাবে তলিয়ে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও শহরগুলির ওপর সাগরের জলের খেলা চলতে থাকবে তখন।

একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিদিন যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমা পড়ছে, তার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নাকি খুব ধীর মন্থর গতিতে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির গড় হার যদি দাঁড়ায় ১৪ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত, তাহলে পৃথিবী জুড়ে বরফ গলে গিয়ে সাগরের বন্যা ঘনিয়ে উঠবে। আবার কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে উঠলে সাগরে বাষ্পীভবনের ঘটনাও বাড়বে এবং তার ফলে মেরু অঞ্চলে তুষারপাতের পরিমাণ যাবে বেড়ে। ঘটনাটা আসলে কোনদিকে যাচ্ছে, সেটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও তো আমাদের জানা উচিত।

মধ্যরাতের সূর্য ও অরোরা

মধ্যরাতের সূর্যের ব্যাপারটা হল পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের এক বিচিত্র ঘটনা। যে কারণগুলির জন্য এই বিচিত্র ঘটনাটি ঘটছে, ওরাই আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং চরমভাবাপন্ন এক জলবায়ুকে গড়ে তুলছে। শীতের ছ মাস সূর্য প্রতিটি মেরুতেই দৃষ্টির আড়ালে থাকে ; এ ঘটনার মূলে রয়েছে পৃথিবীর আপন অক্ষের এবং সূর্য পরিক্রমাপথের ওপর ২২·০৫ ডিগ্রি হেলে থাকা এবং সূর্যের চারপাশে তার বার্ষিক গতি। ছ মাস পৃথিবীর একটি মেরুর মুখ সূর্যের দিকে ফেরান থাকে, পরের ছ মাস দ্বিতীয় মেরুর মুখ থাকে সূর্যের দিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে; বছরের মধ্যে ছ মাস পর্যায়ক্রমে কোন না কোন একটি মেরু অঞ্চল সূর্যের আলো আদৌ লাভ করে না। এমনকি যে ছ মাস সময় সূর্যের আলো কোন একটি মেরুতে এসে পৌঁছয় তখন

তা এতটাই তেরছাভাবে এসে পড়ে যে ওর তাপশক্তি আর কিছু থাকে না বললেই চলে। এর মূলে অবশ্য রয়েছে তুষার এবং বরফের সূর্যের আলোকে প্রতিফলনের ক্ষমতা। এই ঘটনাগুলির জন্যই দুই মেরু অঞ্চলে জলবায়ুর চেহারাটা দাঁড়ায় চরমভাবাপন্ন।

সুমেরুর মত কুমেরুর ক্ষেত্রেও একটি বিচিত্র ব্যাপার হল অরোরা বা মেরুজ্যোতির ছটা। সূর্যদেহজাত প্রোটন কণিকার স্রোত এবং মহাজাগতিক রশ্মিকণা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চুম্বকরশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে গিয়ে হাজির হয় দুই মেরু অঞ্চলে। সেখানে বায়ুমণ্ডলের ৮০ থেকে ৯৬ কিলোমিটার উর্ধ্বে বায়ুর গ্যাসীয় উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণু-পরমাণুরা ওদের সংঘাতে উত্তেজিত হয়ে নানা রঙের আলো ছড়াতে থাকে। এই আলোই হল অরোরা। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের গঠনপ্রকৃতি এবং তার পরিবর্তনের চেহারার সঙ্গে বিজ্ঞানীরা পরিচিত হচ্ছেন।

তথ্য সংগ্রহের কর্মসূচী

অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু বর্তমানে এক আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র-রূপে গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন।

পরস্পরের মধ্যে তথ্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অ্যামেরিকার গবেষণা কেন্দ্র দুটি পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞানীদের আদান-প্রদানের কাজও করে থাকেন প্রায়ই।

গবেষণার ক্ষেত্র হল বিভিন্ন—আবহবিদ্যা এবং উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত বিজ্ঞান, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, কুমেরু মহাদেশে বরফের স্তরের গভীরতা এবং বরফের নিচেকার জমির গঠনপ্রকৃতি, পৃথিবীব্যাপী আবহাওয়ার ওপর কুমেরুর প্রভাব, কুমেরুতে বরফের

পরিমাণ বাড়ছে না কমছে, সে সংক্রান্ত তথ্য। কুমেরু মহাদেশের উপকূলভাগের কাছাকাছি জলে খনিজরূপী পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ প্রচুর—এদের সাহায্যে মাছেদের প্রজনন বাড়িয়ে মেরু সাগরের জলে প্রোটিন খাদ্যের এক বিরাট ক্ষেত্র গড়ে তোলার দিকেও নজর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

কুমেরু মহাদেশের পুরান ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এক বিস্ময়জনক তথ্যের সন্ধান পেলেন। মহাদেশের যে স্বল্প কয়েকটি জায়গায় জমির ওপর বরফের আচ্ছাদন নেই, যেমন হরলিক পর্বতমালা এবং রাণী আলেকজান্দ্রা পর্বত, সেখানে জমি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। ফলে আবিষ্কার ঘটল কয়লার বিশাল বিশাল সব স্তরের, যার মধ্যে দেখা গেল ফার্ণজাতীয় বৃক্ষদের জীবাশ্মও রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, কুমেরু মহাদেশ এক সময়ে আরও অনেক উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গা ছিল এবং বিপুল অরণ্য সম্পদেও সমৃদ্ধ ছিল। এই কয়লার সঞ্চয়গুলিতে যে স্তর বিন্যাস রয়েছে, তার সঙ্গে দক্ষিণ অ্যামেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়লাস্তরের স্তরবিন্যাসের একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের আর একটি বিচিত্র বক্তব্য হল—কুমেরু মহাদেশ জুড়ে রয়েছে এক বিরাট প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেটর, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত দেশ তাদের বাড়তি খাদ্যবস্তুকে সুদীর্ঘ কাল ধরে জমা রাখতে পারবে। ১৯৫৫ সালে এক অভিযাত্রীদলের জনৈক সদস্য ৫০ বছর আগেকার কুমেরু অভিযানের অন্যতম নায়ক স্যাক্‌ল্‌টনের দলের কোন এক তাঁবুতে ফেলে আসা এক টুকরো রুটি খেয়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন—খেতে ভালোই লাগছে, তবে একটু শুকনো। অর্থাৎ হিমশীতল পরিবেশে খাদ্যবস্তুর এতটুকু বিকৃতি ঘটেনি।

কুমেরু মহাদেশের চরম ঠাণ্ডা এবং নির্জনতার পরিবেশে যে মানুষেরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজের জন্য রয়েছেন, তাদের জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

১৯৫৯ সালে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ মিলিতভাবে কুমেরু মহাদেশ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এরা হল—আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এঁরা সবাই সম্মত হয়েছেন—আগামী ৩০ বছরের মধ্যে কুমেরু মহাদেশের কোন ভূখণ্ডের ওপর দাবি জানাবেন না। এছাড়া চুক্তির অন্যান্য শর্ত হল—কুমেরুতে কোন পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা চালান যাবে না, পরস্পরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রগুলি তারা যে কোন সময়ে গিয়ে তদারক করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথাটা ছিল—মানব-জাতির স্বার্থের জন্যই কুমেরু মহাদেশ সব সময় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে এবং পৃথিবীর এই পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশটি যেন কখনই আন্তর্জাতিক মনোমালিন্যের এক ঘাঁটি না হয়ে দাঁড়ায়, সে ব্যাপারেও সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

কুমেরুর অতিথি

কুমেরু মহাদেশ যদিও এক অতি দুর্গম এলাকা, তবুও এ কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাণীবিবর্জিত নয়। সাধারণ গাছপালা বিশেষ কিছু নেই। মহাদেশের অভ্যন্তরভাগে যেখানেই শিলাস্তর বরফের আচ্ছাদন থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেখানেই মস ও লিচেন জাতীয় কিছু কিছু শ্যাওলা জন্মে থাকে।

কোন বড় প্রাণী স্থায়ীভাবে মহাদেশটির ওপর বাস করে না। পেঙ্গুইন ও সীলেদের দু-একটি প্রজাতি বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে উপকূলে এসে বাসা বাঁধে। অ্যাডেলি পেঙ্গুইন কুমেরুতে ডিম পাড়ে গ্রীষ্মকালে। আর বিশালাকৃতি এম্পায়ার পেঙ্গুইন পাড়ে শীতকালে।

পেঙ্গুইনদের বলা হয় ওড়ার ক্ষমতাবিহীন পাখি। কোন সরীসৃপ জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর পাখিদের একটি অতি প্রাচীন প্রজাতি থেকে এদের সৃষ্টি। ওরা যে উড়তে পারে না,

এটাই একটু বিচিত্র, কারণ ওড়বার সামর্থ্যযুক্ত কোন পূর্বপুরুষ থেকেই ওদের সৃষ্টি। মাটির ওপর নয়, জলেই ওরা সবচেয়ে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পারে।

এম্পায়ার পেঙ্গুইন কুমেরু মহাদেশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশে থাকতে পারে, ওর চামড়া ও ফারের পুরু আবরণের জন্য। পুরো গ্রীষ্মকালটা উপকূলের কাছে জলেই তারা কাটায়, তারপর মার্চ মাসে যেই শরৎ এল, অমনি জল থেকে বরফের ডাঙায় উঠে কয়েক কিলোমিটার বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে হাজির হয় গত বছর যে জায়গায় সে ডিম পেরেছিল সেখানে। এভাবে এক একটি জায়গায় ৫০০০০-এর মত পেঙ্গুইন এসে জড়ো হতে পারে—তারপর পুরুষ ও মেয়ে পাখিগুলি জোড়ায় জোড়ায় আলাদা হয়ে যায়। অনেক সময় দুটি মেয়ে পাখি হয়ত একটি পুরুষ পাখিকেই নির্বাচন করে বসল, তখন আবার পুরুষটির অধিকার নিয়ে মেয়ে দুটির মধ্যে ছোটখাট এক লড়াই বেধে যায়।

পুরুষ ও মেয়ে পাখি দুটি একবার জোড় বেঁধে গেলে যতদিন পর্যন্ত না মেয়ে পাখিটি এক পাউণ্ড ওজনের একটি ডিম প্রসব করছে, ততদিন ওরা একসঙ্গে থাকবেই।

ডিমটি প্রসব করার একদিনের মধ্যেই মেয়ে পেঙ্গুইন পাখিটি পুরুষ পাখিটির হাতে ডিমটিকে সমর্পণ করে তা দেবার জন্য। এবারে ওর এক মাসের উপবাসকে ভঙ্গ করার জন্যে ও পাড়ি জমায় সাগরের দিকে।

সাগরের জল এখন প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। শীত ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি সাগরের জল সব বরফে রূপান্তরিত হয়ে বসে আছে। পুরুষ পাখিটিও সাগর থেকে উঠে আসার পর উপবাসের মধ্যেই রয়েছে। প্রায় ষাট দিন বাদে মেয়ে পাখিটি ফিরে না আসা পর্যন্ত ডিমটিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হল ওর। প্রায় তিনমাস চলবে পাখিটির একটানা উপবাস। মেয়ে পাখিটি ফিরে আসার পর ওর এবার সাগরে যাবার পালা। দীর্ঘ উপবাসের

ফলে ওর শরীরের ওজন শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ কমে বসে আছে।

ডিমটি ফোটবার ঠিক আগেই কিন্তু মেয়ে পাখিটি ফিরে আসে। সময়ের বিচারে ওদের এতটুকুও ভুল হয় না। প্রচুর পরিমাণে মাছ খেয়ে ও এখন যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট! কিছু বাড়তি মাছরূপী খাবার ও মুখের ভেতর পুরে নিয়ে এসেছে, ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা বাচ্চাটির মুখের ভেতর ও এবারে যা পুরে দেবে।

বাপমার এত যত্নআত্তি সত্ত্বেও ডিম ফুটে যতগুলো বাচ্চা বেরিয়ে আসে ওদের মাত্র চারভাগের একভাগ প্রাণী আগামী শীতের বরফজমা কনকনে ঠাণ্ডা মাসগুলোর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারবে।

বাচ্চাদের মাছরূপী খাদ্য সংগ্রহের জন্য পেঙ্গুইন বাপ-মাকে বারেবারে সাগরে পাড়ি জমাতে হয়। তারপর যখন গ্রীষ্মের দিন এল, বাচ্চাগুলো ওদের বাপমায়ের সঙ্গে পাড়ি জমাবে সাগরের জলে, যেখানে এখন অজস্র মাছের মেলা।

সীলেদের যে দু-একটি প্রজাতি কুমেরু মহাদেশের উপকূলে এসে সাময়িকভাবে বাসা বাধে, এলিফ্যাণ্ট সীল হল তার মধ্যে একটি। এরা লম্বায় প্রায় ৬০ মিটার এবং ওজনে ৮০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এক একটি পুরুষ সীলের হারেমে বহু মেয়ে সীল থাকতে পারে এবং হারেমের অধিকার নিয়ে পুরুষ সীলগুলির মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড লড়াই বেধে যায়।

পেঙ্গুইন এবং সীলেদের শরীরের তেল একটি মহার্ঘ বস্তু। তাই অর্থলোভী মানুষের হাতে কিছুকাল আগেও এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছিল। বর্তমানে সংরক্ষণের নিয়মকানুনের ফলে আবার এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রী

১৯৮২ সালের ৯ই জানুয়ারী ২৬ জন সদস্যের একটি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দল কুমেরু মহাদেশের উত্তর ভাগের একটি ভূখণ্ডে অবতরণ করে এবং উপকূল থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে

একটি ছোটখাট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন করে। অভিযাত্রী দল বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রটির নাম দিয়েছিলেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী। তাঁরা যখন কুমেরুতে অবতরণ করেন, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল এবং তাপমাত্রা ছিল –১০ থেকে –২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে অভিযাত্রীদল স্থাপন করেছিলেন একটি সৌর ব্যাটারীযুক্ত প্যানেল এবং একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রাহক যন্ত্র।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ছিল। কুমেরু মহাদেশের বরফের আচ্ছাদনের সঙ্গে আমাদের হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পার্বত্য এলাকার বরফের স্তূপের সাদৃশ্য রয়েছে—কুমেরু থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে এই তুলনামূলক বিচার থেকেও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। এছাড়া ভারত মহাসাগর এবং মৌসুমী বায়ু সংক্রান্তও কিছু তথ্য এই অভিযানে সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৮২-৮৩ সালে কুমেরু মহাদেশে দ্বিতীয় ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ১৯৮৩-র শেষের দিকে এবং ১৯৮৪-র গোড়ার দিকে পরিচালিত হয় তৃতীয় অভিযান। এই অভিযানের অভিযাত্রীরা একটি স্থায়ী গবেষণা ও বাসস্থানের কেন্দ্র স্থাপন করেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে। এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কাজও চালানো হয়।

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ভারতের আগ্রহের মূলে যেমন তার খনিজ তেল এবং প্রাণীজ সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ছিল একটি উদ্দেশ্য তেমনি আর একটি কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান—ভারত উপ-মহাদেশের জলবায়ুকে যা বিশেষভাবেই প্রভাবিত করে থাকে। ভূতাত্ত্বিক যুগের এক অতীত পর্বে ভারতবর্ষ, অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যাফ্রিকা এবং দক্ষিণ অ্যামেরিকা যুক্তভাবে একটি অতিকায় মহাদেশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ ছিল। প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে তা ভেঙ্গে বিভিন্ন অংশ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ওদের

বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ভারতবর্ষ ও অ্যান্টার্কটিকার শিলার তুলনামূলক বিচারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

কুমেরু মহাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ জায়গা হল হিমাবৃত। মাত্র দু ভাগ জায়গায় অনাবৃত শিলাস্তর চোখে পড়ে। তৃতীয় ভারতীয় অভিযানের ভূবিদরা একটি পার্বত্য এলাকায় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা ও জরিপের কাজ পরিচালনা করেন। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে শিলার ভেতর খনিজ গঠনের সম্ভাবনাও দেখা যায়।

কুমেরুর সাগর অঞ্চলে প্রতি ২১০০ মিটার গভীর প্রদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ, ক্ষার প্রবণতা, লবণাক্ততা, জলের রাসায়নিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়। মৃত্তিকা এবং তুষার ও বরফের বিভিন্ন নমুনার ওপরও রাসায়নিক অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়েছে।

কুমেরু মহাদেশের সাগর অঞ্চল বিশেষ করে ক্রিলজাতীয় অতি ক্ষুদ্র প্রাণীজ প্ল্যাংকটনে পূর্ণ। ওদের জৈবমূল্য নিরূপণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

কুমেরুতে শীতের সময় একই কর্মসূচী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান ঐ ঋতুকালীন কঠিন পরিস্থিতির জন্যে বিশেষভাবে তৈরি একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী।

ভূগর্ভস্থ সম্পদ কি একদিন ফুরিয়ে যাবে ?

আমাদের এই পৃথিবীর গর্ভে কত সম্পদই না রয়েছে—তেল, কয়লা, আকরিক ধাতু, নানা খনিজ পদার্থ। নানাভাবে এদের আমরা ব্যবহার করে চলেছি। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে পৃথিবী অনন্তরত্ন প্রসবিনী নয় এবং চিরকাল ধরে আমাদের প্রয়োজনকে মেটাবার ক্ষমতাও তার নেই। যে হারে আমরা ভূগর্ভস্থ সম্পদগুলোকে ব্যবহার করে চলেছি তাতে ওদের সঞ্চয়গুলো আর কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, এটাই হল বিশেষজ্ঞদের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির জবাবের ওপরে যে অনেক কিছুই নির্ভর করছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। এ প্রসঙ্গে যে সব সমস্যা মাথা তুলছে বর্তমান প্রবন্ধে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

মাটির গভীরে

একটি ধাতু লোহার কথাই ধরা যাক। যে ৪৫টি ধাতুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে লোহা হল তাদের মধ্যে একটি। বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে ৮০০০ মিশ্র ধাতু (অ্যালয়) তৈরি করে আমরা ওদের নানা ব্যবহারিক কাজে লাগাচ্ছি।

বিশেষজ্ঞদের মোটামুটি অনুমান হল পৃথিবীতে আকরিক লোহার যত সঞ্চয় আমাদের জানা আছে তা দিয়ে আর একশ বছর আমরা চালাতে পারব। ইতিমধ্যে অবশ্য নতুন আরও কিছু সঞ্চয়ের সন্ধান আমরা নিশ্চয়ই পাব কারণ অনুসন্ধানের পদ্ধতিগুলো ক্রমেই উন্নততর হয়ে চলেছে। যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারগুলো এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের

আবহাওয়াকে যদি একেবারেই মিটিয়ে ফেলা যায়, তাহলে লড়াইয়ের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজসরঞ্জাম তৈরির জন্য বহু পরিমাণ ইস্পাতের খরচ বেঁচে যাবে। ইস্পাত তৈরির জন্য আকরিক লোহার প্রয়োজন। এ হল একটি প্রয়োজনীয় ধাতুর এক বিরাট অমানবিক ও অপ্রয়োজনীয় অপচয়কে বন্ধ করা।

আমাদের বিহারের বাদাম পাহাড়, গরুমহিষাণী প্রভৃতি অঞ্চলে খুব উন্নত মানের আকরিক লোহা পাওয়া যায়। এক নিম্নমানের আকরিক লোহা হল ট্যাকোনাইট। পৃথিবীর বহু জায়গায় এদের সঞ্চয় আছে কিন্তু এদের কাজে লাগান অর্থকরী বিচারে বহুদিন পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। এদের ওপরেও এখন নজর দেওয়া হয়েছে। এক বিশেষ ধরনের কারখানা তৈরি হয়েছে যেখানে চার টনের মত ট্যাকোনাইট থেকে এক টনের মত উপাদান নিষ্কাশিত করা হবে যার মধ্যে লোহার পরিমাণ থাকবে শতকরা ষাট ভাগের মত। প্রকৃতির একটি অবহেলিত বস্তুকে এভাবে কাজে লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

লোহার পর অন্য যে ধাতুটি আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সে হল অ্যালুমিনিয়াম। পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ গঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে অক্সিজেন এবং সিলিকন, তার পরেই হল লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের স্থান। অ্যালুমিনিয়ামের যে পরিমাণ সঞ্চয়ের সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তা নাকি ২০৩০ সাল পর্যন্ত যাবার কথা। তবে একটি আশার খবর হল এই, পৃথিবীতে বর্তমানে আমরা যে পরিমাণে আকরিক লোহা, বক্সাইট (অ্যালুমিনিয়ামের আকর) এবং অ্যালুনাইট (অ্যালুমিনিয়াম এবং পটাসিয়ামের মিশ্র আকর) ব্যবহার করছি, পৃথিবীর ত্বকের মধ্যে তার প্রায় ৫০০০ গুণ বেশি পরিমাণে এরা নাকি মজুত রয়েছে। এদের নিষ্কাষিত করার জন্য অর্থনৈতিক বিচারে যুক্তিযুক্ত কোন প্রযুক্তিবিদ্যা আমরা এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারিনি। আগামী ভবিষ্যতে তা সম্ভবপর হবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস।

পৃথিবীর আর একটি বহুললভ্য ধাতু হল টাইটেনিয়াম। খনি থেকে একে তোলার খরচা এখনও খুব বেশি বলে একে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে টাইটেনিয়াম রঙ তৈরির একটি উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরে দেখা গেল এর গুণের শেষ নেই—এ ইস্পাতের চেয়েও হালকা, অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে জোরালো এবং বিশেষভাবে তাপ-প্রতিরোধক, তাই নানাভাবে একে কাজে লাগান যেতে পারে। সমস্যাটা হল অল্প খরচায় একে খনি থেকে তোলা।

খনির আঁধারে

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বহু জায়গায় নানা আকরিক ধাতুর এরকম বহু সঞ্চয় রয়েছে, খনি থেকে যাদের তোলার কাজটা অনেক ব্যয়সাধ্য হবে বলে ওদের গায়ে আমরা হাত লাগাতে পারছি না। একটি উপায়ে খুব কম খরচায় এটা নাকি সম্ভবপর হতে পারে, সে হল ছোটখাট মাপের একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণকে ঘটান। বিস্ফোরণের ফলে যে বড় মাপের ভূকম্পন তরঙ্গ তৈরি হবে, তার ফলে ভূগর্ভের কোন খনি নিচের দিকে প্রায় ৭৫ মিটার পর্যন্ত ধসে যেতে পারে এবং শিলাস্তর ধসে যেতে পারে প্রায় ১৫০ মিটার পর্যন্ত। অর্থাৎ এই উপায়ে খনিগর্ভে যে কোন আকরিক ধাতুকে চূর্ণীকৃত করা সম্ভবপর।

আমাদের দেশে একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু তামার উৎপাদন খুবই কম। এর আকরের সন্ধানও মেলে মাটির অনেক নিচে, যেমন রাজস্থানের কলিহান, বিহারের ঘাটশিলা, অন্ধ্রের কৈলরাম প্রভৃতি এলাকা।

নিম্নমানের আকরিক তামা বিপুল পরিমাণে এইসব খনিতে সঞ্চিত রয়েছে। প্রচলিত খনন পদ্ধতিতে এই আকরিক ধাতু উদ্ধার করা মোটেই লাভজনক হবে না। এক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি হল ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণকে কাজে লাগান। বিস্ফোরণের দ্বারা

আকরক্ষেত্র পর্যন্ত লম্বা চিমনির প্রবেশপথ তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হবে। আকরিক ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় ঐ অ্যাসিডকে চিমনীর তলা থেকে পাম্প করে তুলে এনে তা থেকে আকরিক খনিজকে উদ্ধার করা হবে। অন্য যে কোন আকরিক ধাতুর ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যাবে। যেটুকু তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা আকরিক ধাতু সংক্রামিত হবে, তার নিরাপদ বিলিব্যবস্থা বিজ্ঞানীরা সহজে করতে পারবেন বলে ভরসা দিচ্ছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে ভারত সরকার রাজস্থানের মরুভূমির পোখরান অঞ্চলে ভূগর্ভে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণকে ঘটিয়েছিলেন তার একটি সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় আমরা এভাবে পাচ্ছি।

ধাতুর কথা থেকে এবারে দুটি খনিজ পদার্থ কয়লা ও তেলের কথায় আসা যাক। পৃথিবীর কয়লার মোট যে সঞ্চয়ের সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তা দিয়ে চলবে আরও দুশ বছর থেকে আড়াই শ' বছর। এর মধ্যে আরও নতুন কিছু সঞ্চয়ের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। খনিজ তেলের ব্যাপারটা অত আশাপ্রদ নয়। মধ্য প্রাচ্যের তেলের সঞ্চয় শেষ হবে আর পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যেই। অন্যত্রও মোট সঞ্চয় যা আছে তার আয়ু একশ' বছরের বেশি নয়। নতুন সঞ্চয় কিছু পাওয়া গেলে তার ওপরেই যা কিছু ভরসা। ভারতবর্ষে নতুন সঞ্চয় সন্ধানের কাজের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি সবচেয়ে বেশি।

খনিজ তেল ও কয়লা প্রসঙ্গ

খনিজ তেলের বিকল্প একটি উপাদান আবিষ্কারের জন্যও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের ভারতবর্ষেই এথিল অ্যালকোহল নামে উপাদানটিকে পেট্রোলের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অদূর ভবিষ্যতেই মোটরগাড়ির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পেট্রোলের বদলে অ্যালকোহলকে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে ফেলা সম্ভবপর হবে।

চাষীরা সেচের কাজে যে পাম্প ব্যবহার করেন তা রেকটিফায়েড বা শোধিত স্পিরিট দিয়ে চালান যাবে, যার শতকরা ১০ ভাগ হল এথিল অ্যালকোহল এবং শতকরা পাঁচ ভাগ হল জল। রেকটিফায়েড স্পিরিট হল চিনি শিল্পের একটি উপজাত সামগ্রী যার এক লিটারের দাম হল পেট্রোলের বর্তমান বাজার মূল্যের পনের ভাগের মাত্র এক ভাগ।

একটি অনুসন্ধান কাজের ফলাফল বিজ্ঞানীদের বেশ কিছুটা পরিমাণে বিমর্ষ করে তুলেছে। দেখা গেল, পৃথিবীর মোট তেলের সঞ্চয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ নাকি ভূগর্ভস্থ বীজাণুরাই ধ্বংস করে বসে আছে। ওরা যেন সংসার পাতবার আর কোন জায়গা খুঁজে পেল না। এমনিতেই পৃথিবীজোড়া তেলের উচ্চ মূল্যের সঙ্কট, তার ওপর আবার এই দৌরাত্ম্য। এই সমস্যাকে সামলাবার কোন উপায় অবশ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

আরও একটি দুঃসংবাদ আছে। কয়লার খনিতে আগুন ধরে গিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়ে যে নিঃশেষ হয়ে যায় তার হিসেব রাখতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের দেশেই কত খনিতে এখনও আগুন জ্বলছে। কয়লা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। খনি থেকে কয়লা নিষ্কাষণের সময় ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্যও যেমন আগুন ধরে যায়, তেমনি প্রাকৃতিক কারণেও ঘটে। এই আগুনকে পুরোপুরিভাবে সামলাবার কার্যকরী কোন উপায় এখনও আমাদের জানা নেই। এটাই হল ভাবনার কথা।

কয়লা এবং খনিজ তেল দুটিই হল আমাদের মহার্ঘ্য সম্পদ। এদের যেটুকু সঞ্চয় আমাদের হাতে রয়েছে, সবরকম প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের হাত থেকে এদের আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

সাগরের গভীরে

মহাদেশের জমির অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক সম্পদের সঞ্চয় নিঃশেষিত হবার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা সাগরের প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারের

কাজে নামবেন। পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তার সাগর ও মহাসাগরগুলো।

সাগরের জলে যত খনিজ পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ। এছাড়া অন্য যেসব খনিজ রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন, নিকেল, কোবালট, তামা, দস্তা, সীসে, সোনা ও রূপো। সাগরের জল থেকে ম্যাগনেসিয়ামকে নিষ্কাশনের উপযোগী প্রথম কারখানা তৈরি হয়েছিল অ্যামেরিকায় ১৯৭০ সাল নাগাদ। বছরে ৯০০০ টন ছিল ওর উৎপাদনের পরিমাণ। এখন বছরে উৎপাদনের পরিমাণ হল বহু লক্ষ টন। সাগরের জল থেকে অন্য উপাদানগুলোর নিষ্কাশনের প্রযুক্তিবিদ্যাও প্রস্তুতির পথে।

সাগরের গভীর তলদেশে বহু খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে বিপুল পরিমাণে। অর্থনৈতিক বিচারে ওদের তুলে আনা এখনও পর্যন্ত খুবই ব্যয়সাধ্য হবে বলে বিজ্ঞানীরা একাজে খুব সচেষ্ট হচ্ছেন না।

ভারতের মহীসোপান ও মহাদেশের ঢাল অঞ্চলে ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট এবং গারনেট জাতীয় ভারী খনিজ পদার্থ এবং ফসফোরাইট, ব্যারিয়াম, সিমেন্ট তৈরির কাজের উপযোগী চুনাপাথরের বালুকা এবং কাদার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নামে একটি বস্তুকে নিষ্কাশিত করা যায়, পারমাণবিক শক্তি তৈরির ব্যাপারে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সোভিয়েত সমুদ্রগবেষক জাহাজ ভিতিয়াজ বেশ কয়েক বছর আগে বঙ্গোপসাগরের গভীর প্রদেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ সংগ্রহ করেছিল। সাগরের অভ্যন্তর থেকে এইসব খনিজ সম্পদ সংগ্রহের কার্যকরী পরিকল্পনা আমাদের বিজ্ঞানীরা অদূর ভবিষ্যতে গ্রহণ করবেন সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা তাঁর সহযোগী দুই সোবিয়েত মহাকাশযাত্রীর সঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমাকালীন অবস্থায় ভারতের উত্তর ও উত্তরপূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের ছবি সংগ্রহ করেন। এইসব ছবি তোলা হয়েছিল ইনফ্রা-রেড বা তাপ তরঙ্গের ভিত্তিতে। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের ওপর অবস্থিত ও ভূগর্ভের প্রতিটি বস্তুই হল ছোট বড় নানা মাপের তাপ তরঙ্গের উৎস—তফাতটা নির্ধারিত হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিচারে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভূগর্ভে কোন আকরিক বা খনিজ সম্পদ থাকলে তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে।

রাকেশ শর্মার সংগৃহীত ছবিগুলোর বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ হতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। এই অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিচারে আমরা ভারত ভূখণ্ডের মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হব সন্দেহ নেই।

আমাদের একটিই পৃথিবী আছে

বিরাট মহাবিশ্বের বুকে একটি ছোট্ট টুকরো ধুলিকণার মত হল আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি এক উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাচ্ছে, তাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির মানকে বজায় রাখতে। প্রধানত কৃষিনির্ভর, শিল্পে অনগ্রসর পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি এই প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। অথচ এই দেশগুলিতে প্রায় একশ কোটি মানুষের জীবনে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী হল নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত এই দুই অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতি ও সমৃদ্ধির মধ্যে এই যে বিরাট বৈসাদৃশ্য, পরিবেশ দূষণের আলোচনায় তার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪৫০ কোটি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাই কি প্রধানত প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের মূল কারণ? রাসায়নিক পরিবেশ দূষণের ঘটনাগুলি ঘটছে প্রধানত শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে। শিল্প ও কারখানা, যানবাহন ব্যবস্থা, ভোগ্যপণ্য তৈরির আয়োজনের বিপুল প্রসারের মধ্য দিয়ে যে সব উপজাত সামগ্রী ও উচ্ছিষ্ট জমা পড়ছে মাটিতে, জলে ও বাতাসে, তার ফলেই ঘটছে পরিবেশ দূষণ। এই দূষণের প্রভাব ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলির মানুষেরাও তার প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না।

যে তথ্য অজানা

অ্যামেরিকার জনৈক পরিবেশবিজ্ঞানী প্রায় বছর দশেক আগে একটি সমীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পাঁচশ'র মত শক্তিরূপী দাস

প্রতিটি অ্যামেরিকাবাসীর সেবায় নিযুক্ত। একটি শক্তিরূপী দাস একটি শক্তসমর্থ মানুষের মোট শ্রমশক্তির সামর্থ্যকে ধারণ করে। মোটর গাড়ি, ফ্রীজ, রেডিও, টিভি, ওয়াসিং মেশিন ইত্যাদি অজস্র যান্ত্রিক উপকরণ হল এই শক্তিরূপী দাসের দল। একটি অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই যান্ত্রিক সেবকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, হয়ত পঞ্চাশেরও নিচে। উন্নত দেশগুলির শাসক ও শিল্পপতিদের কাছে একটি মস্ত বড় দুঃস্বপ্ন হল এই, যদি আজ অনুন্নত দেশগুলির প্রতিটি মানুষ সমৃদ্ধ দেশগুলির মানুষের গড়পড়তা জীবন যাত্রার মানকে দাবি করে বসে, তাহলে তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন।

পশ্চিম দুনিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির ধনপতিরা তাই আমাদের অনবরত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে চলেছে, তোমরা আমাদের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে শিল্পগত সমৃদ্ধির পেছনে ছুট না। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, এই অপরিণামদর্শিতার ফলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিভাবে দূষিত করে বসে আছি এবং সেই দুষ্কর্মের কত বড় মূল্য আমরা এখনও দিয়ে চলেছি।

আমাদের বুঝতে হবে, এ জাতীয় উপদেশ বর্ষণের পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা হল, আমাদের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদগুলিকে সংরক্ষণ করতে আমাদের প্ররোচিত করা, যাতে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ দেশগুলির শিল্পপতিরা ওই বস্তুগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের জীবনযাত্রা ও শিল্পগত সমৃদ্ধির মানকে বজায় রাখতে পারে।

পশ্চিম জগত থেকে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত দুনিয়া জোড়া রাজনীতির এটাই হল এক মস্ত চাল। এ ফাঁদে আমরা ধরা দিতে চাইছি না। আমরা সর্বক্ষেত্রেই সমৃদ্ধিকে চাইছি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত না করে, তার স্বাস্থ্যকে আদৌ বিপন্ন না করেই আমরা সেটা চাইছি। আমাদের এই চাওয়ার মাপকাঠিটা তুলনা-মূলক বিচারে এখনও পর্যন্ত উচ্চমার্গী নয়। সেটাই আমাদের রক্ষা-কবচের মত কাজ করবে সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে পশ্চিম দুনিয়া হল রাসায়নিক দূষণের উৎস, সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা এবং সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের দেশেই প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণের বিরুদ্ধে গত কয়েক দশক ধরে যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছেন, তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাকে অর্জন করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা দৃঢ় সংগ্রাম চালাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যে বুদ্ধিজীবিদের নামগুলি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাঁরা হলেন রেনেঁ দুবো, র‍্যাচেল কার্সন, বাকমিনিস্টার ফুলার, লুই মামফোর্ড এবং জোনাথান সেল। সেলের লেখা সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ' সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাণীজগৎ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তার এক ভয়ঙ্কর ছবি সেল এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

জমি হল সম্পদ

বহুকাল ধরে প্রায় সার্বজনীন ধারণাটি ছিল, আমাদের এই পৃথিবী এত বড় একটি মহাজাগতিক বস্তু যে আমরা যথেচ্ছভাবে তার প্রকৃতি ও সম্পদকে আবহমান কাল ধরে উপভোগ করে যেতে পারব। ধারণাটি নিতান্তই অবাস্তব কারণ আমরা জানি আমাদের এই পৃথিবীর ব্যাস হল মাত্র ১২৮০০ কিলোমিটার এবং তার পরিধির মাপ হল ৪০০০০ কিলোমিটার। দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে মানুষ পৃথিবীর স্থলভাগের শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগ অঞ্চলের ওপর কৃষিকাজকে চালু করেছে। আরও শতকরা ১২ থেকে ১৮ ভাগ জায়গাকে সে ব্যবহার করছে তৃণভূমি ও পশুচারণভূমিরূপে এবং শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ জায়গার ওপর সে অর্থকরী বিচারে উপযোগী অরণ্য অঞ্চলকে সৃজন করেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর স্থলভাগের

শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ অঞ্চলকে মানুষ কোন না কোন রকম ভাবে অর্থনৈতিক বিচারে উপযোগী কাজে লাগাচ্ছে।

মনে রাখা দরকার, গঠনপ্রকৃতির বিচারে পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ জমির উৎপাদিকা শক্তি খুবই কম। ঐসব অঞ্চলের জলবায়ুর প্রকৃতি হয় খুব ঠাণ্ডা অথবা খুবই তপ্ত। উর্বর অঞ্চলগুলিতে অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় কর্ষণযোগ্য মৃত্তিকাকে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ফলটা দাঁড়িয়েছে মারাত্মক। প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ হেক্টর পরিমাণ মৃত্তিকা এর ফলে ধ্বংস হয়ে চলেছে। মনে রাখা দরকার, মাত্র এক ইঞ্চি বা আড়াই সেন্টিমিটার প্রস্থযুক্ত মৃত্তিকা তৈরি করতে প্রকৃতির সময় লাগে প্রায় পাঁচশ বছর। মানুষের হাতে মৃত্তিকার এই ক্ষয় তাই প্রায় অপূরণীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর এটা ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন অ্যামেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে প্রায় একশ কোটি মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি একটি মস্ত বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে যেহেতু এই বৃদ্ধিটা প্রধানত ঘটছে অনুন্নত দেশগুলিতেই। এই বৃদ্ধির হার হল বছরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি অর্থাৎ একদিনে প্রায় ৩০০০০০-এর মত। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ তো আর অফুরন্ত নয়, আর এ জাতীয় জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগকেই মানুষ ফলনের কাজে লাগাচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে জমির ফলন বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু সেই বৃদ্ধির পরিমাণও বর্তমানে প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে বসে আছে। অতিরিক্ত অজৈব সার ব্যবহারের ফলস্বরূপ আমরা পাচ্ছি জমির বন্ধ্যাত্বকে। এর সঙ্গে খরা, অনাবৃষ্টি ও বন্যার সম্ভাবনাগুলিও সব সময়েই রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন ব্যবস্থাকেও

যদি সমান মাপে বাড়ান না যায়, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে দুনিয়াজোড়া অনাহার ও দুর্ভিক্ষ। দুর্ভাগ্যবশত অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘটনাটি কী ঘটছে দেখা যাক। মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর অরণ্যজাত কাঠের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগকে কাজে লাগাচ্ছে, পৃথিবীর নদীগুলির জলসম্পদের শতকরা প্রায় ১০ ভাগকে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করছে এবং পৃথিবীর নদীনালা সাগরে মাছের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগকে সে সংগ্রহ করছে তার প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা মেটাতে। আমরা জানি প্রকৃতির এই সম্পদ ফুরিয়ে যাবে না, তা ক্রমাগত তৈরি হয়ে চলেছে।

দুশ্চিন্তাটা দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে নিয়ে যারা একবার নিঃশেষ হয়ে গেলে আর নতুন করে গড়ে উঠবে না। তা হল আকরিক ধাতু ও খনিজ পদার্থ। বর্তমানে প্রতি বছর বিভিন্ন শিল্পকাজের প্রয়োজনে প্রায় ১০০০০ কোটি টন ধাতু ও খনিজকে পৃথিবীর জঠর থেকে তোলা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হল, যে হারে এদের ব্যবহার বেড়ে চলেছে তাতে এ শতাব্দীর শেষে এই খরচার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬০০০০ কোটি টনের কোঠায়। এই বৃদ্ধির মাপটা যে আবার এখানেই ঠেকে থাকবে না, ক্রমাগত বেড়েই চলবে তা তো আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

এখন দেখা যাক, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধাতুর মোট যে সঞ্চয়ের সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তার আয়ু আর কতদিন? হিসেবটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অ্যালুমিনিয়ামের সঞ্চয় রয়েছে ৫৭০ বছরের মত, লোহার হল ২৫০, দস্তার ২৩, তামার ক্ষেত্রে ২৯, সীসের ১৯ এবং টিনের ক্ষেত্রে হল ৩৫ বছরের মত। অর্থাৎ আগামী ২০০০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যেই পৃথিবীর সীসে, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম, নিকেল, মলিবডেনাম, উলফ্রাম এবং তামার আবিষ্কৃত যাবতীয় সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে বসবে। ২৫০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর

বাদবাকি অন্যসব ধাতুও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অবশ্য ইতিমধ্যে নতুন কোন সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া গেলে তা দিয়ে আরও কিছুকাল কাজ চলবে।

কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসরূপী রাসায়নিক জ্বালানির মোট সঞ্চয়ের হিসেব যা পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতি বছর তা ব্যবহারের পরিমাণ যে হারে বেড়ে চলেছে তা থেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আগামী ১৫০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে এরাও নিঃশেষিত হবে। সাগরের মহীসোপান এবং তলদেশ অঞ্চল থেকে এইসব জ্বালানির সংগ্রহকাজ বাড়ান গেলে হয়ত আরও কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তারপর কী হবে? তা এখনও জানা নেই ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অন্য যে বিপর্যয়গুলো ঘনিয়ে উঠছে, তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবার চেষ্টা করব।

এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে

পৃথিবী জুড়ে শিল্পব্যবস্থা, যানবাহন, যান্ত্রিক কৃষিকাজ ও বিদ্যুৎশক্তি তৈরির ব্যবস্থাগুলোর বিপুল প্রসারের মধ্য দিয়ে জল মাটি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে এবং এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলেছে, এ প্রসঙ্গে সাবধানবাণী বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছুকাল ধরেই উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। যে তথ্যগুলো ওরা আমাদের সামনে রাখছেন তা থেকে আমরা দেখছি বর্তমানে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে প্রায় ২০ কোটি টন কার্বন মনোক্সাইড, ৫০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ১৪·৫ কোটি টন সালফার ডাই-অক্সাইড, ৫·৫ কোটি টন নাইট্রিক অক্সাইড ও ৫·৫ কোটি টন বিভিন্ন শ্রেণীর কার্বনের অনুপ্রবেশ ঘটছে। যে কোন অঞ্চলের বাতাসে এদের যে কোন একটি উপাদান নির্দিষ্ট নিরাপদ মাত্রার ওপরে পৌঁছে গেলেই আমরা ঐ অঞ্চলের বাতাসকে 'দূষিত' এই আখ্যায় ভূষিত করব। দূষিত মাত্রায় মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এই উপাদানগুলোর প্রভাব নিতান্তই ক্ষতিকারক।

গ্রিনহাউস এফেক্ট

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হল ·০৩ ভাগ। গত ৫০ বছরে সারা পৃথিবী জুড়ে এই গ্যাসীয় উপাদানটির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগের মত। কার্বন ডাই-অক্সাইডের বড় মাপের (তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) তাপ তরঙ্গ শোষণের ক্ষমতা রয়েছে ঠিক যে ব্যাপারটা কাচের ক্ষেত্রে আমরা ঘটতে দেখি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে গ্রিন হাউসগুলোর কাচের তৈরি দেয়ালের মধ্য দিয়ে সূর্যের ছোট মাপের তাপ তরঙ্গ অনায়াসে প্রবেশ করে ভেতরের মাটিকে তপ্ত করে তোলে। মাটি থেকে যে বড় মাপের তাপ তরঙ্গ নিঃসৃত হয় তা কিন্তু আর কাচের দেয়ালের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে বাইরে ঠাণ্ডা হলেও গ্রিন হাউসের ভেতরটা গরম থাকে। এই ব্যাপারটাকে বলে 'গ্রিনহাউস এফেক্ট'। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে উঠলে ঠিক এই 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' জাতীয় একটি ঘটনাই ঘটতে পারে। অর্থাৎ ঐ গ্যাসের আবরণটি জমি থেকে নিঃসৃত তাপ তরঙ্গকে বন্দী করে বায়ুর গড়পড়তা তাপমাত্রা, প্রকারান্তরে পৃথিবীর গড়পড়তা তাপমাত্রাকেই বাড়িয়ে তুলবে।

১৯২০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী এক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছিল পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলে গড় তাপমাত্রার প্রবণতা হল বাড়তির দিকে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত বেড়ে ওঠে, তাহলে দুই মেরু অঞ্চলে জমাট বাঁধা বরফের স্তূপ গলে গিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সাগরের পৃষ্ঠভাগ প্রায় ৭০ মিটারের মত উঁচু হয়ে উঠবে এবং সাগরের জল এক বিরাট অঞ্চলকে প্লাবিত করে বসবে। প্রশ্নটা হল, আমরা সত্যিই কি এজাতীয় একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছি ?

পৃথিবীর তাপমাত্রা কি কমছে ?

১৯৫০-এর মাঝামাঝি থেকে আর একটি বিচিত্র ব্যাপার শুরু হল।

পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গায় গড় তাপমাত্রা কমতে দেখা গেল। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রিড ব্রাইসন হঠাৎ পৃথিবীর কতগুলো জায়গায় তাপমাত্রা কমার ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ভারতের রাজস্থানের মরুভূমির ওপর একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ তিনি তখন করছিলেন। প্রায় ৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত এই মরুভূমি অঞ্চলটি এককালে অত্যন্ত উর্বর, সবুজ ভূমি ছিল কিন্তু মানুষের পরিকল্পনাবিহীন কৃষিকাজ, নির্বিচারে পশুচারণ ও জ্বালানির প্রয়োজনে অরণ্য উৎসাদনের ফলে আজ তার এই শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে। মরুভূমির আগ্রাসন থেকে অঞ্চলটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় অধ্যাপক ব্রাইসনের কাজ ছিল তারই উপায় নির্ধারণ করা।

বিমানে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ব্রাইসন দেখলেন, একটি নীল রঙের কুজ্ঝটিকা জমি থেকে প্রায় ৭০০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটার ওপর যেন একটি পর্দার মত ঝুলে রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, এই কুজ্ঝটিকার উৎস কারখানা নয়। কৃষিকাজের পর মাঠে যেসব খড়কুটো পড়ে থাকে সেগুলোকে এক জায়গায় জড় করে আগুন জ্বালাবার রেওয়াজ আছে গ্রামাঞ্চলে। সেই অগ্নিসঞ্জাত বস্তুকণা যেমন এর একটি উৎস, তেমনি মরুভূমি ও বৃক্ষহীন অনাবৃত প্রান্তর থেকে বায়ুবাহিত ধূলো এর আর একটি উৎস। এ জাতীয় একটি কুজ্ঝটিকা স্তরের অনেকখানি সূর্যের আলোকে আড়াল করার ক্ষমতা রয়েছে, যে আলো এর ওপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যাবে। ফলে এর নিচে পৃথিবীর যে অংশ, তার তাপমাত্রা কমবে।

বিমান থেকে তোলা ছবিতে দেখা গেল, ব্রেজিল এবং মধ্য আফ্রিকার ওপরেও এ জাতীয় একটি নীলাভ কুজ্ঝটিকা ছড়িয়ে আছে, জমি থেকে যার উচ্চতা ১০০০ থেকে ৩০০০ মিটারের মত।

বায়ুমণ্ডলে কুজ্ঝটিকাজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আর একটি উৎসের সন্ধান পেলেন ব্রাইসন। তিনি দেখলেন একটি কালচে

বাদামী রঙের পর্দা প'রস্য উপসাগর থেকে পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত তেল উৎপাদনের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের ওপর ছড়িয়ে আছে। ব্রাইসনের ভাবনা হল, তাহলে মানুষ কি বায়ুমণ্ডলে এত বিপুল পরিমাণে ধুলো এবং অন্যান্য বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, যার ফলে গোটা পৃথিবীর তাপমাত্রাই কমে আসতে পারে ?

বাতাসে ধুলো বাড়ছে

বায়ুমণ্ডলে ধুলো জমে তার অপরিচ্ছন্নতাকে কীভাবে বাড়িয়ে তুলছে, কতগুলো জায়গা থেকে সমীক্ষালব্ধ তথ্যগুলোর ওপর চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে। ১৯০০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ওয়াশিংটন শহরের ওপর ধুলোর মাত্রা বেড়েছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, সুইজারল্যাণ্ডে যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র দাভোসে বেড়েছিল শতকরা ৮০ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনা লোয়া পাহাড়ের ওপর ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত দশ বছরব্যাপী সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। মৌনা লোয়া যেহেতু শিল্প প্রধান এলাকা থেকে অনেক দূরে, তাই বোঝা গেল, ব্যাপারটা ঘটছে সারা পৃথিবী জুড়ে।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা 'নিরি'র কয়েক বছরব্যাপী একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতার প্রতি বর্গ কিলোমিটার পরিমিত ক্ষেত্রে মাসে প্রায় ৫০ টনের মত ধুলো বায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। শীতকালে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে মাসে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ টনের মত। কলকাতার ওপরকার বাতাসে তাহলে কি পরিমাণে ধুলো জমে রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

বায়ুতে ধুলোর আধিক্যের জন্য যদি তার স্বচ্ছতা বর্তমানের তুলনায় শতকরা তিন থেকে চার ভাগ মাত্র কমে আসে তাহলেই ভূলাকার জমির গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত কমবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বাতাসে ধুলোকণাগুলি যেমন অনেকখানি সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে, তেমনি জলকণাগুলোর ঘনীভবনের মধ্য দিয়ে মেঘ তৈরির একটি চমৎকার আধারও হল ওরা, ফলে প্রকারান্তরে আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে ওদের।

বায়ু দূষণের বড় উৎস

বায়ুকে দূষিত করে তার অপরিচ্ছন্নতাকে বাড়িয়ে তুলছে আরও এমন দুটি বস্তু, যাদের বাদ দিয়েও কিন্তু আমাদের চলা অসম্ভব। বস্তু দুটি হল মোটরগাড়ি ও বিমান। মোটরগাড়ি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে অন্য যে সব উপাদান বাতাসে জমা পড়ছে ওরা হল কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন ও অ্যাসবেসটসের ধুলো। প্রতিটি উপাদানই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

'নিরি'র সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার যে সব রাস্তায় মোটরগাড়ি চলাফেরা করে বেশি পরিমাণে, সেখানকার বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের মাপ হল বায়ুর প্রতি দশ লক্ষভাগ উপাদানের মধ্যে ২৯০-র মত, যেখানে নিরাপদ মাত্রা হল ১০০। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের লোহিত কণিকাদের অক্সিজেন পরিবহণের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। ফলে স্নায়ুকেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজারের ওপর জেট বিমান বায়ুমণ্ডলে চলাফেরা করছে। শব্দোত্তর (সুপারসনিক) বেগসম্পন্ন বিমানগুলিও ক্রমেই বেশি সংখ্যায় আকাশে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। জেট ও শব্দোত্তর বিমান থেকে নিষ্ক্রান্ত গ্যাসের মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও সালফার অক্সাইড। সালফার অক্সাইড থেকে তৈরি হয় সালফেট এয়ারসোল, যে বস্তুটি বাতাসকে অপরিচ্ছন্ন করে সূর্যের আলোর অনুপ্রবেশকেই কমিয়ে তোলে।

জেট বিমান থেকে নিষ্ক্রান্ত নাইট্রোজেন অক্সাইডের মারাত্মক

চরিত্র ধরা পড়ছে অন্যভাবে। বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উর্ধ্বে স্ট্র্যাটোসফিয়ার অঞ্চলে যে ওজোন গ্যাসের স্তর থাকার জন্য মহাকাশ থেকে অতিবেগুনী রশ্মি তার মারাত্মক চরিত্র নিয়ে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, নাইট্রোজেন অক্সাইড সেই ওজোনের অণুগুলিকে বিজারিত করে (রিডিউস) ওদের অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত করছে। অতিবেগুনী রশ্মিকে বাধা দেবার ক্ষমতা অক্সিজেনের নেই।

এই একই সর্বনাশা কাজ করছে ফ্রিঅন নামে আর একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, বিভিন্ন শিল্পকাজে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফ্রিঅন বায়ুর স্ট্র্যাটোসফিয়ার অঞ্চলে পৌঁছবার পর সূর্যের প্রতিক্রিয়ায় ক্লোরিনকে নির্গত করে। এই ক্লোরিন ওজোনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার ধ্বংসের রাস্তা তৈরি করে দেয়।

আসল কথাটা হল, জেট বিমানের মাধ্যমেই হোক বা ফ্রিঅন গ্যাসের মাধ্যমেই হোক, বায়ুর ওজোন স্তরে ওজোনের ঘাটতি কি ঘটছে? যদি ঘাটতি ঘটে, তবে বেশিমাত্রায় অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশের ব্যবস্থা করে নিয়ে চামড়ার ক্যান্সার রোগের পরিমাণকেই তুলবে বাড়িয়ে। বিশেষজ্ঞরা অতি সাবধানে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর যে উপাদানেরা ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন করতে পারে, দেখা গেল তার শতকরা ৫০ ভাগই বাতাসে জমা পড়ছে অ্যামেরিকা থেকে। খোদ অ্যামেরিকাতেই আরও কিছু কিছু দেশের মত এজাতীয় উপাদানের উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে চালু করা হয়েছে, সেটাই হল আশার কথা।

এক নিয়মের রাজত্ব

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জল, মাটি এবং বায়ুমণ্ডলকে দেখছেন একটি সমগ্র ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ রূপে, যার একটি অংশ থেকে আর একটি অংশে কমবেশি পরিমাণে বস্তু ও শক্তির আদানপ্রদান চলেছে। সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে শক্তির সাম্য বজায় থাকছে এমনভাবে যাতে পৃথিবীতে

প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়। এই সাম্যের অবস্থার মধ্যে কোন একটি ক্ষেত্রে বিরাট রকমের কোন পরিবর্তন না ঘটলে প্রাণীজগতে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই। যেমন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় কমে গেলে একমাত্র অ্যানিরবিক ব্যাকটিরিয়া ছাড়া আর সব প্রাণীই মারা পড়বে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রশিল্পে দহনকাজের জন্য এত অক্সিজেন লেগে যাচ্ছে, যার সবটা গাছপালার কাছ থেকে পূরণ হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। সাগরে যে ডাইঅ্যাটমরূপী ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ রয়েছে, পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ অক্সিজেন ওরা তৈরি করে থাকে। জমি থেকে ধুয়ে আসা নদীবাহিত ডি ডি টি-র প্রভাব ঐ উদ্ভিজ্জের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক; যে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা অক্সিজেন তৈরি করে থাকে, ডি ডি টি সেই ক্ষমতাকে শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়ে দেয়।

বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে, তার পরিমাণও যদি শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ বেড়ে ওঠে, তাহলে তৃণাবৃত প্রান্তর এবং জঙ্গলগুলোতে সবসময় আগুন ধরতে থাকবে।

তাপ ও দূষিতকরণ

শহরগুলোতে ঘরবাড়ি এবং যানবাহন তাপীয় দূষিতকরণের যেমন একটি উৎস, তেমনি বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলো বাতাসে বিপুল পরিমাণ তাপকে ছড়িয়ে এই দূষিতকরণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলছে। সমশক্তিসম্পন্ন একটি কয়লাচালিত শক্তি-কেন্দ্রের তুলনায় এই তাপের পরিমাণ প্রায় একশ গুণ বেশি। দূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক সংযোজক প্রক্রিয়ায় চালিত শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ হবে আরও অনেক বেশি। জনসংখ্যা এবং শিল্পব্যবস্থার ক্রমিক বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত তাপের পরিমাণও বেড়েই চলেছে।

বিশেষজ্ঞরা জানতে চাইছেন, আমরা আমাদের পরিবেশের মধ্যে

এত বেশি পরিমাণে তাপ সংযোজন করছি না ত, যা তার মহাকাশে তাপ ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। বিকিরণের জমা ও খরচের মধ্যে যে সাম্য অবস্থা, তার জমার অঙ্কে শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি ঘটলেই পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের গড় তাপমাত্রা ১০ থেকে ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত বেড়ে উঠতে পারে। ফলে পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যে এক চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘনিয়ে উঠবে।

এমন হতে পারে, সমুদ্র তার তাপশক্তি ধারণের বিপুল ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাপীয় দূষিতকরণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে চলেছে। বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত জমা পড়ছে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তার একটা বিরাট অংশকেও সমুদ্র শুষে নেয়। সমুদ্র হল যেন পৃথিবীর শ্বাসযন্ত্রের মত।

সাগর দূষণ

সাগরকেও আমরা দূষিত করে চলেছি। তেলবাহী জাহাজগুলির খোল-ধোয়া জল এবং মাঝে মাঝে তেলবাহী জাহাজ ডুবি হলেও সাগরের উপরিভাগে অনেক জায়গায় তেলের একটা আস্তরণকে তৈরি করে তোলে। তেলের স্তর সাগরের জল থেকে বাতাসে তাপ ছড়িয়ে দেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ফলে সাগর পৃথিবীর এক জায়গার তাপ অবশোষণ করে অন্য জায়গায় তাকে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যে যে সমতাকে রক্ষা করছিল, তার মূলেই আঘাতটা এসে পড়ে।

এভাবে একদিন হয়ত আমরা দেখব, সাগরের গড় তাপমাত্রার মধ্যে এমনই পরিবর্তন ঘটে বসে আছে, যা হয়ত পৃথিবীব্যাপী এক সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশকে তৈরি করে বসল। আমাদের কিন্তু তখন সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই বসবাস করতে হবে, কারণ সাগরের বিরাট কারখানাটির কলকব্জাগুলি একবার আংশিকভাবে বিকল হলে তাকে ত্রুটিমুক্ত করা আজও কিন্তু আমাদের সব ক্ষমতারই বাইরে।

সাগর দূষিত হচ্ছে আরও নানাভাবে। বিভিন্ন শিল্পজাত যে সব

উচ্ছিষ্ট নদীতে জমা করা হচ্ছে, যেমন পারদ, সীসে, আর্সেনিক ইত্যাদি, এরা নদীবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয় সাগরে। সাগরের স্রোতের ঘাড়ে চেপে এরা পৌঁছে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। সাগরে বাস করে যে সব প্রাণী, বিশেষ করে মাছেরা সংক্রামিত হচ্ছে ঐসব বিষাক্ত উপাদানের দ্বারা। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে জাপানের মিনামাটা দ্বীপপুঞ্জের ১১১ জন মানুষ পারদসংক্রামিত মাছ খেয়ে পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে ৪৩ জন মারা যায় এবং জীবিত পরিবারগুলির মধ্যে ১৯ জন শিশু জন্মায় ক্ষতিগ্রস্ত মগজকে নিয়ে। 'মিনামাটা ব্যাধি' নামটির সৃষ্টি হয় এভাবেই।

শিল্পজাত উচ্ছিষ্টরূপে প্রতি বছর প্রায় ৮০০০ টন পারদ মহাদেশগুলি থেকে সাগরে জমা পড়ছে। সীসে জমা পড়ছে প্রায় দু লক্ষ টন এবং আর্সেনিক প্রায় পাঁচ লক্ষ টন। সাগরের প্রাণীরা কতখানি বিপন্ন, আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। অর্থাৎ মানুষের কাজের দ্বারা সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অগণিত প্রাণী, পৃথিবীর জল, মাটি ও বাতাসের এলাকা জুড়ে যারা বাস করছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এমন এক জটিল পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করছে মানুষ যার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই এইসব প্রাণীদের।

ভারতে পরিবেশ দূষণ

ভারতবর্ষ যেহেতু কৃষিপ্রধান দেশ, তাই এখানে রাসায়নিক দূষণের ব্যাপারটা প্রধানত শিল্পপ্রধান শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার বাতাস অগণিত কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নিষ্ক্রান্ত বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের দ্বারা দূষিত। বায়ু দূষণের জন্য ঘটছে বিভিন্ন শ্বাসকষ্টজনিত ব্যাধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যান্সার।

কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যে হুগলী নদী ও শহরের মধ্যেকার টালির নালা জাতীয় খালগুলির জল মানুষের মল মিশ্রিত বিভিন্ন বীজাণুর দ্বারা সংক্রামিত। এদের প্রভাবে ঘটছে আমাশা,

কলেরা, টাইফয়েড, জণ্ডিস, হেপাটাইটিস, মেনিনজাইটিস, পোলিও-মায়েলাইটিস জাতীয় ব্যাধি। আমাশা রোগে শিশুমৃত্যুর হার কলকাতা শহরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। রাসায়নিক-ভাবে মানুষের মল পরিশোধনের ব্যবস্থা যেমন কলকাতায় নেই, তেমনি ভারতের অন্য শহরগুলিতেও নেই।

সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে অরণ্যের উৎসাদন চলেছে অব্যাহত-গতিতে। বর্তমানে প্রদেশটির শতকরা মাত্র তেরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে এই অরণ্য, যেখানে থাকবার কথা শতকরা ৩৩ ভাগ অঞ্চলে। শহর কলকাতার মোট এলাকার শতকরা ছ'ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে গাছপালা।

গাছ যেমন বিপুল পরিমাণ ধুলোকে ধারণ করে বাতাসকে পরিচ্ছন্ন রাখে, তেমনি দূষিত গ্যাসীয় উপাদানকেও ওরা শোষণ করে। উত্তর বাংলার ডুয়ার্স ও সুন্দরবনের অরণ্যের ভেতরে মাত্র তু দশক আগেও যারা গিয়েছেন নিবিড় ঘন গাছের মেলা তাদের মুগ্ধ করেছে। আজ স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন চক্রের যোগসাজসে অরণ্যের ভেতর থেকে গাছ উৎপাটিত হচ্ছে নির্বিচারে।

মানুষের মলজনিত জলদূষণে দিল্লি শহরের বহু মানুষ কিছুকাল আগে পর্যন্তও জণ্ডিস, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতেন। এখন যদিও পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত, দিল্লির মলবাহিত যমুনার জল আগ্রায় পৌঁছে সেখানকার মানুষের জীবনে বিপর্যয়কে ডেকে আনছে। আগ্রার মানুষেরা তাই ক্ষোভের সঙ্গে বলে থাকেন, দিল্লির লোকেরা ওদের পায়খানার মলকে তাদের জন্যে ভেটস্বরূপ পাঠিয়ে দেন।

বোম্বাই শহরের উপকূল অঞ্চলে সাগরের জল বিভিন্ন শিল্পজাত বিশেষ করে ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্পের উচ্ছিষ্টের দ্বারা এমনভাবে সংক্রামিত যে ওখানকার চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার খাতিরে সাগরের উপকূল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মাছ খেতে বারণ করে থাকেন।

পশ্চিম তুনিয়ার দেশগুলিতে মানুষের মলঘটিত জল দূষণের

ব্যাপারটা তাঁরা মোটামুটি সামলে উঠেছেন, যেটা আমরা এখনও পেরে উঠি নি। রাসায়নিক জল ও বায়ু দূষণের সমস্যা এখনও সেখানে নিতান্তই জটিল। বিধিনিষেধের বেড়াজাল সেখানে যেমন আছে, তা আবার লঙ্ঘিতও হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এমন কোন আইন তৈরি হল না, মানুষের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার খাতিরে যে আইনগুলি শিল্পসংস্থাগুলিকে মেনে চলতে বাধ্য করানো যায়।

মনে রাখা দরকার—প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণের দ্বারা আমরা বয়স্করা যত না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বর্তমানের এবং আগামী ভবিষ্যতের শিশুরা। কারণ ওদের জৈবিক গঠনের মধ্যে এই দূষণের বিরুদ্ধে ছোটখাট মাপেরও কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে নি।

সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের সবাইকে তাই সচেতনভাবে নামতে হবে একটি অভিযানে, যার লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করা। কাজটা খুবই কঠিন, কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবেশ দূষণের প্রভাবে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে সহজে কাজে নামান যায় না।

বহু কোটি বছরের বিবর্তনের ধারাপর্যায়ে প্রকৃতি পৃথিবীতে আমাদের বাঁচার জন্য প্রাণধারণের উপযোগী যে পরিবেশ তৈরি করেছে, তাকে রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই, প্রকৃতির নয়। এই পরিবেশের ভারসাম্য একবার কোন কারণে বিপর্যস্ত হলে আর নতুন করে তাকে কিন্তু গড়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের একটিই পৃথিবী আছে। এই পৃথিবী ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

বায়ুমণ্ডলে বাড়ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড

একটি ঘটনায় বিশেষজ্ঞেরা ক্রমেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন। ঘটনাটি হল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপী গ্যাসীয় উপাদানটির পরিমাণ নাকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফলে পৃথিবীতে প্রাণীজগতের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার !

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান, যাদের শতকরা পরিমাণ হল—নাইট্রোজেন ৭৮.০৩ ভাগ, অক্সিজেন ২০.৯৯ ভাগ, আর্গন ০.৯৪ ভাগ, কার্বন ডাই-অক্সাইড .০২৫ ভাগ। এছাড়া সামান্য পরিমাণে রয়েছে নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস এবং বেশ কিছু পরিমাণে জলীয় বাষ্প। মানুষের শিল্পকাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া এই বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক সংস্থান একটু একটু করে পালটাতে শুরু করেছে।

যে কোন দহনজাত প্রক্রিয়া থেকেই তৈরি হবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর যে তিনশ' কোটি টন কয়লা ও ১৩০০ কোটি ব্যারেল তেল (প্রতি বছরই যে পরিমাণটা বেড়ে চলেছে) পোড়ানো হচ্ছে, তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপী গ্যাসীয় উপাদানটাই তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে এবং তার সবটাই জমা পড়ছে বায়ুমণ্ডলে। ১৯৭১ সালে পৃথিবীব্যাপী এই গ্যাসীয় উপাদানটির পরিমাপ থেকে ধরা পড়েছিল, এর শতকরা পরিমাণ দাঁড়িয়েছে .০৩২ ভাগ, যেখানে থাকার কথা .০২৫ ভাগ।

অতি-সাম্প্রতিককালে আর একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ১৮০০ সালে শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে বিভিন্ন দহন কাজের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ। এই মাত্রা ২০২০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে উঠতে পারে যদি না কয়লা, খনিজ তেলজাতীয় জীবাশ্মরূপী জ্বালানী ব্যবহারের হার যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা যায়, যার কোন সম্ভাবনা আপাতত আদৌ দেখা যাচ্ছে না।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিশেষজ্ঞেরা আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। পৃথিবীর তাপমাত্রা কোথাও কোথাও যেন স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় একটু বেশি তপ্ত হতে চাইছে। এর লক্ষণ-গুলো ছিল অনেক জায়গায় হিমবাহগুলোর গলতে শুরু করা, বার্চ এবং স্প্রুস জাতীয় ঠাণ্ডা পরিবেশের গাছগুলো বিপুল সংখ্যায় মারা যাওয়া, তুন্দ্রা এবং রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের অনাবৃত অঞ্চল বৃক্ষরাজিতে ভরে ওঠা।

১৯২০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পরিমাপ থেকে দেখা গেল, অ্যামেরিকার গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ৩.৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত। অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশের গড় তাপমাত্রা শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছরে ৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত বেড়ে উঠল। হিমবাহ-গুলো গলতে শুরু করার পর দেখা গেল, সারা পৃথিবী জুড়ে সাগরের গড় উচ্চতা ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রায় পনের সেন্টিমিটারের মত বেড়ে উঠেছে।

বিচিত্র ব্যাপারটা ছিল এই, তাপমাত্রার বৃদ্ধি পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে কিন্তু একেবারেই ঘটতে দেখা যায় নি বরং কোন কোন অঞ্চলে ঠাণ্ডার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল বেশি, যেমন মধ্য এশিয়ার জনহীন এলাকা, ইন্দোনেশিয়া ও উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়া, হাডসন ও উপসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ অ্যামেরিকার মধ্যবর্তী ও দক্ষিণাঞ্চল।

একই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার এই বৈপরিত্য থেকে বোঝা গেল যে, পৃথিবীর কতগুলো অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণটা এই নয় যে, সূর্য থেকে তাপের বিকিরণের মাত্রাটাই হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। তাই যদি হতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর ওপর তার প্রভাবটা হত সমান (সূর্য আগামী সাত আটশ' কোটি বছর ধরে সুনির্দিষ্ট হারে আলো তাপ প্রভৃতি বিকিরণ ঘটিয়ে চলবে, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞেরা নিশ্চিত)। যখন দেখা যাচ্ছে, তাপমাত্রা কমবার প্রবণতা সেই অঞ্চলগুলোতেই বেশি, যারা রয়েছে শিল্পপ্রধান এলাকা থেকে অনেক দূরে এবং লোকবসতি যেখানে অনেক কম, তখন বুঝতে হবে বাদবাকি অঞ্চলগুলোতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূলে প্রকৃতির কোন কারসাজি নেই, বরং সেটা মানুষেরই দ্বারা ঘটছে।

১৯৩৮ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জি এস ক্যালেণ্ডার বলে বসলেন, মানুষ বায়ুমণ্ডলে এত বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, যার ফলে পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলের গড়পড়তা তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

১৯৫৮ সালে অ্যামেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গিলবার্ট প্লাসের অনুসন্ধানে ধরা পড়ল, বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড তার স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় শতকরা প্রায় ১০ থেকে ১৪ ভাগের মত বেড়ে উঠেছে, অর্থাৎ পূর্বে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বায়ুর মধ্যে ঐ গ্যাসীয় উপাদানটি যেখানে ছিল ২৯০ ভাগের মত, সেই মাপটা তখন দাঁড়িয়েছে ৩৩০ ভাগের মত। বিশেষজ্ঞেরা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে যে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম কর্মসূচী ছিল বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাপ নির্ণয় করা। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩—এই পাঁচ বছরব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখলেন, প্রতি বছর প্রায় পাঁচশ' কোটি টনের মত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুতে জমা পড়ছে।

গ্যাসের উৎস

কয়লা এবং খনিজ তেল, জীবাশ্মরূপী যে দুটি জ্বালানিকে আমরা গৃহকর্মে ও নানা শিল্পকাজে ব্যবহার করি, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরির এরা হল দুটি প্রধান উৎস। এ ছাড়া মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, কলকারখানা হল অন্যান্য প্রধান উৎস। জলাভূমিগুলো শুকিয়ে গিয়েও বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে থাকে। এ ছাড়া পর্বতের শিলাস্তর ক্ষয়ে গিয়েও বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া পাচ্ছে।

বিভিন্ন উৎস থেকে ছাড়া পাওয়া এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি বিরাট অংশ গাছপালা গ্রহণ করে এবং জল, সূর্যের আলো এবং পাতার সবুজ অংশ ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের খাদ্য শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেটকে তৈরি করে এবং একই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনকে মুক্ত করে। গাছেদের সঙ্গে আবার আমাদের রয়েছে একটি পারস্পরিক উপকারিতার সম্পর্ক। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ছেড়ে দিই, তা গ্রহণ করে গাছেরা এবং গাছেদের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করি অক্সিজেনকে।

দহনকাজ এবং বিভিন্ন উৎস থেকে ছাড়া পাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটা বিরাট অংশকে গাছপালার মত সমুদ্রও গ্রহণ করে নিয়ে জলে দ্রবীভূত করে। সাগরের জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রূপান্তরিত হয় কার্বনেটে, যে বস্তুটি সাগরের বাসিন্দা শামুক, ঝিনুক এবং শেল মাছের দেহের শক্ত খোল জাতীয় আবরণকে গড়তে সাহায্য করে। বৃষ্টির জলেও বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতির রাজত্বে এতকাল ধরে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপী চক্রটি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, ফলে বায়ুতে এই গ্যাসীয় উপাদানটির পরিমাণ এক নিরাপদ মাত্রার মধ্যেই বজায় থাকছিল। কিন্তু উন্নত

দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান শিল্পীকরণ, জ্বালানি ব্যবহার ও যানবাহন চলাচলের ফলে এক বিরাট বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে। সমুদ্রের জল এই গ্যাসীয় উপাদানটির দ্বারা বর্তমানে এতটাই সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে যে তার পক্ষে আর বাড়তি কোন পরিমাণ গ্রহণ করা সম্ভবপরই নয়। ফলে বায়ুতে এই গ্যাসটির মাত্রা বাড়তে বাধ্য। যার ফলে বায়ুর তাপ এবং প্রকারান্তরে পৃথিবীর গড়পড়তা তাপমাত্রাও বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর গড়পড়তা তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত বেড়ে উঠলেই পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের তুষার স্তূপ সম্পূর্ণভাবে গলে গিয়ে পৃথিবীর সাগরে এত বিপুল পরিমাণ জলকে মুক্ত করে বসবে যে সাগরের পৃষ্ঠভাগের গড় উচ্চতা বেড়ে উঠবে ৫ মিটারের মত এবং সারা পৃথিবী জুড়ে উপকূলভাগের এক বিরাট অঞ্চল জলের তলায় যাবে তলিয়ে।

মনে রাখা দরকার গত ১০০ বছর ধরে কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানীকে জ্বালিয়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা আমরা যে পরিমাণে বাড়িয়েছি, প্রকৃতির এক হাজার বছর সময় লাগবে তার বিষক্রিয়ার হাত থেকে বায়ুমণ্ডলকে মুক্ত করতে। এটাও আবার সম্ভবপর হবে যদি সাবধান হবার সমস্ত ব্যবস্থাগুলো এখন থেকেই আমরা চালু করতে পারি। তা না হলেই কিন্তু বিপদ।

পারমাণবিক মারণাস্ত্র

পারমাণবিক বোমার বিধ্বংসী রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি প্রায় ৪১ বছর আগে। জাপানের হিরোসিমা শহরের ওপর ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে যে পারমাণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছিল তাতে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ৭০,০০০ মানুষ। এক লক্ষের মত মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল তেজস্ক্রিয়তা জনিত নানা ব্যাধিতে। ঠিক তিনদিন বাদে ৯ই আগস্ট জাপানের নাগাসাকি শহরের ওপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এই দুটি শহরের বহু মানুষ তিলে তিলে মারা গেছে পরবর্তীকালে। সেই বীভৎস ঘটনার ক্ষতচিহ্ন শরীরে ধারণ করে আজও বেশ কিছু মানুষ বেঁচে আছে।

এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক, পৃথিবীর কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই সেটা চাইবেন না। একটি আধুনিক ২০ মেগাটন (২ কোটি সাধারণ টি এন টি বোমার ক্ষমতার সমান) হাইড্রোজেন বোমাকে যদি একটি বড় শহরের ওপর জমির কাছাকাছি ফাটান যায়, তা হলে ঘটনাটা যেভাবে ঘটবে, তা হল এই—প্রায় আড়াই কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হবে, যার তাপ-মাত্রা দাঁড়াবে দু' থেকে তিন কোটি ডিগ্রি ফারেনহিটের কাছাকাছি। অগ্নি-গোলকটির নিচে শহরের যাবতীয় বস্তু—ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, এবং মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণী মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

বোমাটিকে যেখানে ফেলা হল, তার ১০ কিলোমিটার দূরেও যে সব মানুষ রয়েছে, তারা সবাই আলোর বেগে ধাবমান একটি নিস্তব্ধ তাপ তরঙ্গের সংঘাতে মুহূর্তের মধ্যে দগ্ধ হয়ে মারা যাবে।

তাপের প্রভাবে কাচ পর্যন্ত গলে যাবে এবং শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী চাপ তরঙ্গ এবং ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার বেগে ধাবমান জোরাল বায়ুস্রোতের ধাক্কায় সমস্ত বাড়ি ধসে পড়বে।

ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে ধাবমান মৃদু বায়ুস্রোতও ২৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিলে তিলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে, তা তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবে। কিছুটা কম মাত্রার তেজস্ক্রিয়তায় যারা আক্রান্ত হবে, তাদের ক্ষেত্রে ঘটবে লিউকেমিয়া ও অন্য নানা ধরনের ক্যান্সার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ও গর্ভস্থ ভ্রূণের অস্বাভাবিক গঠন ও বিকৃতি। পরবর্তী বংশধরদের ক্ষেত্রে দেখা দেবে জিনঘটিত নানা ধরণের ত্রুটি।

মধ্যযুগে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ আজ পর্যন্ত তার সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে যত আগ্নেয় বোমা ব্যবহার করেছে তার চেয়েও প্রায় তিনগুণ বেশি শক্তি ধারণ করে একটি আধুনিক হাইড্রোজেন বোমা।

দুটি শক্তিজোটের মধ্যে এ জাতীয় একটি ভয়াবহ ঘটনার আদান-প্রদান এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং উত্তর গোলার্ধের বেশির ভাগ মানুষই মারা পড়বে। ঐ সমগ্র অঞ্চলে এই ঘটনার পর পৃথিবীর চেহারাটা হবে অন্য রকম—রুক্ষ কঠিন আবহাওয়া হবে অনেক বেশি ঠাণ্ডা এবং বহু সহস্র বছরব্যাপী তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে থাকবে গোটা অঞ্চলটা।

সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের (ইউ এন ও) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর পারমাণবিক অস্ত্রের মোট পরিমাণ খুব শীগগিরই দাঁড়াবে হিরোসিমার ওপর যে পারমাণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছিল সেই শক্তির মাপের পনের লক্ষ বোমার সমান। এদের মিলিত বিধ্বংসী ক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫০০০ কোটি সাধারণ টি এন টি বোমার সমান। এই পরিমাণ বোমার শক্তির

সাহায্যে গোটা পৃথিবীর মানুষ সমেত প্রতিটি প্রাণীকে শুধু একবার নয়, পনের বার করে মেরে ফেলা যায়।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের বর্তমান মিলিত বাৎসরিক সামরিক বাজেট হল প্রায় ৩,৫০০০০ কোটি টাকা। দক্ষিণ এশিয়া, দূর প্রাচ্য ও আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশগুলি, যেখানে প্রায় ১৫০ কোটি লোক বাস করে, তাদের সারা বছরের সমগ্র জাতীয় উৎপাদনঘটিত আয়ের চেয়েও এই অঙ্ক হল বেশি।

সম্প্রতিকালে আর একটি বিচিত্র পারমাণবিক অস্ত্রের কথা আমরা শুনছি—সেটি হল নিউট্রন বোমা। এর দ্বারা পৃথিবীর সম্পত্তি ধ্বংসের কাজটা খুব বেশি হবে না, কিন্তু যে মারাত্মক নিউট্রন রশ্মির বিকীরণ এ ঘটাবে, তার তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষ এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। স্বভাবতই সারা পৃথিবীব্যপী এই বোমা তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

আগুন আবিষ্কার করে একদিকে মানুষ যেমন তার সভ্যতাকে গড়ে তুলেছিল, তেমনি তাকে পুড়িয়ে ছারখারও করেছে। দোষটা আগুনের ছিল না। তেমনি পারমাণবিক বোমার মধ্যে যে বিপুল শক্তি লুকিয়ে আছে, ধ্বংসের ছবিটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও ঐ শক্তিকে কাজে লাগান হচ্ছে। বোমার মধ্যে পরমাণুর এই ধ্বংসের শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগান হচ্ছে, তার সঙ্গে আমরা প্রথমে পরিচয় গ্রহণ করব।

শক্তির উৎস

পারমাণবিক শক্তির উৎস হল পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রক। সে শক্তিলাভের উপায়ও আমাদের জানা আছে। তা হল, পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন (ফিসন)। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইউরেনিয়াম। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে আছে ৯২টি প্রোটন (পজিটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণা) এবং চারপাশে

বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে ৯২টি ইলেকট্রন (নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণা)। এ ছাড়াও রয়েছে আর একটি বস্তুকণা, যার নাম হল নিউট্রন (এর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই)।

সাধারণ ইউরেনিয়ামের মধ্যে তিনটি আইসোটোপ রয়েছে— ইউ-২৩৮, ইউ-২৩৫ ও ইই-২৩৪। রাসায়নিক গুণাগুণের বিচারে মূল পদার্থের সঙ্গে ওদের আইসোটোপের কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তফাৎটা হল শুধু পারমাণবিক ভরের বেলায়, যেটা ঘটছে নিউট্রনের সংখ্যা কমবেশি হবার ফলে। যেমন ইউরেনিয়ামের প্রতিটি আইসোটোপের পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা হল ৯২টি, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা হল যথাক্রমে ১৪৬, ১৪৩ ও ১৪২টি। প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা যোগ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রে যা দাঁড়াবে, তাই হল পরমাণুদের পারমাণবিক ভর।

সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর শতকরা ৯৯·৩ ভাগ হল ইউ-২৩৮। বাকি প্রায় ·৭ ভাগ হল ইউ-২৩৫। ইউ-২৩৪-এর পরিমাণ অতি নগণ্য, তার জন্যে একে হিসাব থেকে বাদ দিয়েই ধরা হয়। এখন কথাটা হল, একমাত্র ইউ-২৩৫-এর পরমাণু কেন্দ্রককেই কৃত্রিমভাবে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভবপর এবং তা হলে পরমাণুর ভর (মাস) রূপান্তরিত হবে শক্তিতে। (পদার্থের ভরকে যে শক্তিতে রূপ দেওয়া যায় এবং শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায় ভরে, মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে একটি ঐতিহাসিক আঙ্কিক সূত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন।)

আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ভরকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তা হলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই হাজার কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টার সমান, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ শক্তির সাহায্যে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আড়াই হাজার কোটি বাতিকে এক ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে। গোটা ভারতবর্ষের প্রায় এক বছরের বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা এ দিয়ে মিটতে পারে। এই ভাঙ্গন ঘটানর জন্য হাতিয়ার চাই।

সেই হাতিয়ার বা বুলেটের কাজ করবে নিউট্রন, কারণ নিউট্রন বৈদ্যুতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বস্তুকণা। ইউ-২৩৫-এর পরমাণু কেন্দ্রকের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে চলেছে ইলেকট্রনরূপী মেঘের আবর্তন ; এই ঋণাত্মক বস্তুকণাদের রক্ষীব্যূহের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করতে নিউট্রনকে কোন বেগই পেতে হবে না।

একটি ধীরগতি নিউট্রনের আঘাতে একটি ইউ-২৩৫ পরমাণু কেন্দ্রকের বস্তুর সবটুকু কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে না। ভাঙ্গে এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর তাইতেই জন্ম নেয় প্রচণ্ড শক্তি ও দুটি হাল্কা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। প্রচণ্ড বেগে ছাড়া পায় কয়েকটি বিটা কণা বা ইলেকট্রন ও গামা রশ্মি। আর সব চেয়ে দরকারি যে উপাদানটি পাওয়া যায়, তা হল আরও বেশি নিউট্রন। এই নিউট্রনেরা আবার প্রতিবেশী পরমাণুদের কেন্দ্রকে ভাঙ্গার কাজ জুড়ে দেয়। ছাড়া পায় আরও বেশি নিউট্রন এবং জন্মেই অন্য পরমাণু কেন্দ্রকদের ভাঙ্গার কাজে লেগে যায়। ভাঙ্গার কাজটা এভাবে শৃঙ্খলের মত ছড়িয়ে যায় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে পরম্পর প্রক্রিয়া (চেন্ রিঅ্যাকশন)।

ক্রান্তিমাত্রিক ভর

ইউ-২৩৫-এর পরমাণুদের কেন্দ্রকের পর কেন্দ্রকে ভাঙ্গন ঘটতে ঘটতে ছাড়া পাবে এক বিপুল শক্তি আর তাই থেকে উদ্ভব হবে এক প্রচণ্ড তাপের। পারমাণবিক বোমার কাজের ধারাটিও ঠিক এমনি। বহু সংখ্যক ইউ-১৩৫-এর পরমাণু কেন্দ্রকের ভাঙ্গন থেকে এভাবে হিরোসিমার ওপর ফেলা পারমাণবিক বোমার তাপ ও ধ্বংসের ক্ষমতা জন্ম নিতে পারে। নিউট্রনের দ্বারা পরমাণু কেন্দ্রকের এই ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার নাম হল বিভাজন (ফিসন)। এখানে একটি কথা রয়েছে। যে বাড়তি নিউট্রনগুলি তৈরি হচ্ছে ইউ-২৩৫-এর পরিমাণের মধ্যে, ওরা যদি পরমাণুদের ঘাড়ে না পড়ে ফসকে বেরিয়ে যায়, তা হলে বিভাজনের পালার সেইখানেই ঘটবে ইতি।

পরমাণুগুলির ভেতরটা প্রায় ফাঁকা গড়ের মাঠ বলেই এই ভাবনাটা রয়েছে। অতএব আমাদের চাই ইউরেনিয়াম ধাতুর এত বড় একটি স্তূপ (পাইল), যাতে ফসকে যাওয়া নিউট্রনের সব ক্ষতিপূরণ হয়েও কাজ চালানর মত নিউট্রনের সরবরাহ চালু থাকে। পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ পরিমাণের ইউরেনিয়াম স্তূপের নাম দিয়েছেন ক্রান্তিমাত্রিক ভর (ক্রিটিকাল মাস)।

একটি পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রে এই ক্রান্তিমাত্রিক ভরের পরিমাণ এক কিলোগ্রামের কম হলে চলবে না। বস্তুর পরিমাণটিকে সমান মাপের দুটো টুকরোয় আলাদা করে রাখা হয়। টুকরো দুটোকে এক সঙ্গে জুড়ে দিলেই শুরু হয়ে যায় পরম্পর প্রক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় তা ফেটে পড়ে ও সমগ্র বস্তুর এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হিরোসিমা, নাগাসাকির ওপর তার যে চেহারা আমরা দেখেছি, তাতেই আমাদের আতঙ্কের শেষ নেই। বস্তুর সবটা ভর শক্তিতে রূপ পেলে যে কি হত তা ভাবার চেষ্টা না করাটাই ভাল।

যে ক্ষতি হল অপূরণীয়

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, যদি কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর কেন্দ্রক বিস্ফোরিত হয়, তা হলে ছিটকে বেরিয়ে আসে একটি ক্ষুদ্র কণিকা ও এক গুচ্ছ রশ্মি। এই কণিকাটি সাধারণত হয়ে থাকে একটি ইলেকট্রন বা বিটা কণিকা এবং হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক বা আলফা কণিকা। আর এই রশ্মিটি সাধারণত হয়ে থাকে গামা রশ্মি, যা কৃতির দিক থেকে অনেকটা কণিকার মতই। এদের গতিপথে যদি কোন জীবন্ত তন্ত্রী পড়ে, তা হলে হয় ওরা সেখানেই থেমে যায় কিংবা ওদের গতি হয় স্তিমিত। ফলে ওদের তেজ নিঃসৃত হয় পুরোপুরি কিংবা আংশিক ভাবে। এর ফলে জীবকোষের ক্রোমোসোমের মত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি কাঠামোর মধ্যেও ভাঙ্গন আসতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে দ্রুতগামী কণিকা

ও রশ্মি জীবকোষের ক্ষতিসাধন করে। তারপর কয়েকটি সম্ভাবনা থাকে। জীবকোষটি হয়ত পূরোপূরি ভাবেই নিজেকে মেরামত করে নিতে পারল। কিংবা জীবকোষটির সরাসরি মৃত্যু ঘটল। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল এই কারণে।

যে সব জীবকোষের কাজ অপরিহার্য রকমের জরুরী, যেমন নতুন তন্তু বা চামড়া গড়ে তোলা—তাদের মধ্যে শতকরা একভাগের মত জীবকোষের যদি মৃত্যু ঘটে, তা হলে মারাত্মক কোন ফল হবে না বলেই আশা করা চলে। কিন্তু গর্ভের শিশুরা পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে বা এমনকি শিশুদের চেয়েও অনেক বেশি স্পর্শকাতর। হয়ত এমন কয়েকটি জীবকোষের মৃত্যু ঘটল, যারা চোখ বা হাত গড়ে তুলত—তার ফলে শেষ পর্যন্ত জন্ম হল একটি বিকট জীবের।

আর পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনাটা আসে অন্যভাবে। এক্ষেত্রে জীবকোষের কাজের ধরন পালটে যায়। জীবকোষটি বেঁচে থাকে এবং জীবকোষ থেকে পুনরুৎপাদনও হতে থাকে, কিন্তু জীবকোষটি আর পুরোপুরি নিজেকে মেরামত করে নিতে পারে না। এ ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় পরিব্যক্তি (মিউটেসন)। পরিব্যক্তি কখনও কখনও হয়ত ক্ষতিকারক নাও হতে পারে, কিন্তু তা কদাচিৎই ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ফল হয় মারাত্মক।

মারাত্মক মাত্রার নিচে বিভিন্ন পরিমাণের তেজস্ক্রিয়তায় স্বল্পায়ুতা, অকালবার্ধক্য, প্রজনন শক্তির হ্রাস বা লোপ, ক্যানসার, রক্তের ক্যানসার বা লিউকেমিয়া, পুড়ে যাওয়া, চামড়ার কর্কশতা, চুল পড়ে যাওয়া, রক্তমোক্ষণ, পেটের গোলমাল প্রভৃতি হতে পারে। হিরোসিমা, নাগাসাকিতে এই ঘটনাগুলি কমবেশি পরিমাণে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটার পর নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এদের মধ্যে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে প্রধানত স্ট্রনশিয়াম-৯০, আয়োডিন-১৩১

এবং সিজিয়াম-১৩৭—এরা সবাই হল মূল পদার্থদের আইসোটোপ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাত্রেই আমরা জানি, ক্রমাগত ভেঙ্গে গিয়ে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মিকে ছড়াতে থাকে। যে সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়, ঐ সময়কে তার অর্ধ-জীবনকাল (হাফ লাইফ) বলে। তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম বিটা রশ্মি বিকীরণ করে এবং এর অর্ধ-জীবনকাল হল ২৮ বছর। তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম বিটা এবং মারাত্মক গামা রশ্মি বিকীরণকারী, এর অর্ধ-জীবন হল ২৭ বছর। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনও বিটা ও গামা রশ্মির বিকীরণ ঘটায়, তবে এর অর্ধ-জীবনকাল হল মাত্র আট দিন।

পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের সময় যে নানাধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি হয়, ওরা মেঘপুঞ্জরূপে ব্যাঙের ছাতার আকারে ওপরে উঠে আসে এবং বিভিন্ন সময়ে তা আবার তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত রূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। বিস্ফোরণ যদি মাটির কাছাকাছি হয়, তা হলে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় ভস্মপাত হবে। এর তেজস্ক্রিয়তা তীব্রতার দিক থেকে খুব বেশি হলেও বিস্ফোরণস্থলের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেহেতু পূর্বেকার পারমাণবিক পরীক্ষাগুলি নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা সমুদ্রে করা হয়েছিল, সেজন্য এই ভস্মপাত মানুষকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে নি। দ্বিতীয়টি হল, মাধ্যমিক বা ট্রপোস্ফেরিক ভস্মপাত, যা বায়ুমণ্ডলের আট থেকে ষোল-কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং কয়েক-দিন থেকে কয়েক মাসের মধ্যে নেমে আসে। সবচেয়ে ব্যাপক, সুদূর-প্রসারী ও বিলম্বিত হল স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ভস্মপাত, যা অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার আকারে ঊর্ধ্বে বায়ুস্তরে সঞ্চিত থাকে এবং ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে সারা পৃথিবীতে নেমে আসে। অবশ্য এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক হ্রস্বজীবী আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

হাইড্রোজেন বোমা

পারমাণবিক বোমা এখন নিতান্তই ছোটখাট ব্যাপার। আসল মারণাস্ত্র হল হাইড্রোজেন বোমা। হাইড্রোজেন বোমার মূল উপাদান হল ডয়টেরিয়াম বা ভারী হাইড্রোজেন। সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে আছে একটিমাত্র প্রোটন আর ডয়টেরিয়ামের কেন্দ্রকে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন—এ হল সাধারণ হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। প্রকৃতির রাজত্বে সাধারণ হাইড্রোজেনের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ হল ডয়টেরিয়াম। সাগরের জলে এই উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে আছে।

ডয়টেরিয়ামের কাছ থেকে প্রচুর শক্তি পেতে হলে তুলনায় ভারী হিলিয়াম পরমাণুতে এর রূপ পাল্টে ফেলতে হবে। তার জন্যে এর সঙ্গে সংযোজন ঘটাতে হবে সাধারণ হাইড্রোজেনের অথবা হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় আইসোটোপ ট্রাইটিয়ামের (যার পরমাণু-কেন্দ্রকে আছে একটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন)। এই সংযোজন প্রক্রিয়া থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করতে হলে দেড় কোটি থেকে আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট তাপের পরিমণ্ডল দরকার। কিন্তু ট্রাইটিয়াম প্রকৃতির রাজ্যে বড়ই দুর্লভ। এ হল আসলে কৃত্রিমভাবে তৈরি হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। হালকা মৌলিক পদার্থ লিথিয়াম নিউট্রন কণিকার সংযোজনে ট্রাইটিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের নক্ষত্র সূর্যকে আমরা বলতে পারি একটি নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন বোমা। সূর্যের কেন্দ্রে প্রায় আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট তাপের পরিবেশে হাইড্রোজেন পরমাণুরা মিলে হিলিয়াম পরমাণুদের গড়ে চলেছে। পদার্থের এই রূপান্তরের সময় প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য থেকে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেনরূপী গ্যাসীয় বস্তু শক্তির আকারে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যে এই শক্তিসৃষ্টির ব্যাপারটা এত সুনিয়ন্ত্রিত যে আগামী পাঁচশ কোটি বছরের মধ্যে কোন

মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা নেই। সূর্যের বস্তুর সঞ্চয় খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে, এই ভেবে কারুর অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হবারও প্রয়োজন নেই।

হাইড্রোজেন বোমার কেন্দ্রে ডয়টেরিয়াম ও সাধারণ বা ভারী হাইড্রোজেনের মধ্যে সংযোজন ঘটানর জন্য প্রয়োজনীয় তাপসৃষ্টির (আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট) উদ্দেশ্যে একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণকে আগে ঘটান হয়, যার ফলে হিলিয়াম পরমাণুরা তৈরি হতে থাকে। পারমাণবিক বোমার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে বস্তুর ভর এখানে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ফলে সেই শক্তির চেহারাও হয় ভয়াবহ।

ভারতের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা

পৃথিবীর কিছু ছোট ছোট দেশ পারমাণবিক অস্ত্রনির্মাণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের নীতি এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারেই সে আগ্রহী। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সামর্থ্যকে নিয়ে। এ ব্যাপারে পাকিস্থানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেই এ আলোচনা উঠছে। বার বছর আগের একটি ঘটনার কথা স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে এসে পড়ছে।

১৯৭৪ সালের ১৪ই মে ভারতের রাজস্থানের মরুভূমি এলাকায় পোখরান নামে একটি জায়গায় ভারত একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণকে ঘটিয়েছিল। ঘটনাটির আকস্মিকতায় দেশী বিদেশী অনেক মহলই তখন স্তম্ভিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটু আগের ইতিহাস রয়েছে।

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি ভাবার নেতৃত্বে ভারতের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। পরমাণুর অভ্যন্তরে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে সে সংক্রান্ত গবেষণা, তাই ছিল এই কমিশনের

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। ভারতে পারমাণবিক শক্তি গবেষণার কাজে ইতিমধ্যেই একটি পদক্ষেপ ঘটেছে—১৯৫৬ সালে ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর অপ্সরাকে চালু করা হয়েছে। পরমাণুবিজ্ঞানে গবেষণার কাজ ছাড়াও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যাবে অপ্সরার কাছ থেকে—মানুষের বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের কাজে যারা লাগবে। আরও চারটি গবেষণামূলক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর তৈরি হয়েছে এরপর—সাইরাস, জেরলিনা পূর্ণিমা এবং সম্প্রতিকালে ধ্রুব।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে—ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র গুজরাটের তারাপুর থেকে বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ শুরু হল। তারাপুরের বিদ্যুৎশক্তি তৈরির সামর্থ্য ছিল ৪০০ মেগাওয়াটের মত। রাজস্থানে রাণাপ্রতাপ সাগরে ভারতের দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয় ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। প্রায় ২০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি তৈরির সামর্থ্য এর রয়েছে।

তামিলনাড়ুর মহাবলিপুরমের কাছে কলপাক্কমে ভারতের তৃতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রটিও চালু হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নয়, মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করা হোক, এ ব্যাপারে ভারত বরাবরই একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে যে মহতী বিশ্ব বিজ্ঞান সম্মেলন হয়েছিল, ভারতের বিজ্ঞানী হোমি ভাবা তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

রাজস্থানের পোখরানে

ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার সাহায্যে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান এবং নদীর ওপর বাঁধ তৈরির ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অ্যামেরিকা ইতিপূর্বেই বেশ কিছু পরীক্ষা-কাজে হাত দিয়েছে। সরকারি মত অনুযায়ী পোখরানে ভারতের

পরীক্ষাকাজটির মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই, অর্থাৎ কল্যাণকর ও গঠনমূলক।

পোখরানে যে বস্তুটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল, অনেকে তাকে বলেছেন পারমাণবিক বোমা, কারণ দুটিরই কাজের পদ্ধতি ছিল একই। বস্তুটির শক্তির মাপ বলা হয়েছিল ১০ থেকে ১৫ কিলোটন (এক কিলোটন হল এক হাজার টন) টি এন টি-র সমান। টি এন টি বা ট্রাইনাইট্রোটলিউয়েন হল অত্যন্ত দাহ্যশীল একটি বস্তু—বিস্ফোরক বোমা তৈরির কাজে যাকে ব্যবহার করা হয়। ১০ থেকে ১৫ হাজার টন টি এন টি-র মধ্যে এক সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটালে যে পরিমাণ শক্তি তৈরি হবে, পোখরানে পারমাণবিক বস্তুটির শক্তির মাপ ছিল তাই। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের হিরোসিমার ওপর যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার শক্তির মাপ ছিল ২০,০০০ টন টি এন টি-র সমান।

পারমাণবিক বস্তুটির মধ্যে বিভাজনশীল পদার্থরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল প্লুটোনিয়াম-২৩৯কে। প্লুটোনিয়াম হল এমন একটি মৌলিক পদার্থ, যাকে আমরা প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় পাই না—নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরের জ্বালানি অবশেষের মধ্যেই প্রথম এর সন্ধান পাওয়া যায়। মৌলিক পদার্থের পর্যায়িক সরণীতে (পিরিয়ডিক টেবল অফ দি এলিমেন্টস) প্লুটোনিয়ামের স্থান হল ৯৪, ইউরেনিয়ামের হল ৯২। ৯৩ থেকে ১১৬ পর্যন্ত যে কটি নতুন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার এ পর্যন্ত ঘটেছে, তারা কেউই প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—এরা আবিষ্কৃত হয়েছে পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে।

প্লুটোনিয়াম-২৩৯ হল প্লুটোনিয়ামের এমন একটি আইসোটোপ যার পরমাণুর কেন্দ্রকে রয়েছে ৯৪টি প্রোটন ও ১৪৩টি নিউট্রন। পোখরানে যে পারমাণবিক বস্তুখণ্ডটির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল, তার ক্ষেত্রে ক্রান্তিমাত্রিক ভরের (এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে) পরিমাণ ছিল ৩০০ গ্রাম, অর্থাৎ ৩০০ গ্রামের মত ঐ বস্তু এক জায়গায়

জড়ো হলেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটবে। সমান মাপের দুটো আলাদা টুকরোকে এক জায়গায় জড়ো করে ক্রান্তিমাত্রিক ভরে পৌঁছবার জন্য যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, তাকে বলা হচ্ছে ইমপ্লোসন। রাসায়নিক পদ্ধতিতে একটি পারমাণবিক বস্তুখণ্ডের আভ্যন্তরীন চাপ ও তার ফলে ওর ঘনত্বকে বাড়িয়ে বস্তুখণ্ডটি অক্রান্তিমাত্রিক (সাবক্রিটিক্যাল) পর্যায় থেকে ক্রান্তিমাত্রিক পর্যায়ে পৌঁছে দেবার যে পদ্ধতি, তাই হল ইমপ্লোসন।

প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পারমাণবিক জ্বালানিটির যে পরিমাণকে রাজস্থানের বিস্ফোরকটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মাপ ছিল দশ থেকে পনের কিলোগ্রামের মত (প্লুটোনিয়ামের ক্রান্তি-মাত্রিক ভরের চেয়ে যা অনেক বেশি)। বিস্ফোরণটি ঘটান হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০০ মিটার নিচে।

বরাবরই ভারতের বক্তব্য ছিল পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে লাগানো, তা থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে শিল্প ব্যবস্থা ও সাধারণ প্রয়োজনকে মেটানো। সারা পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারকে কমানোর জন্যে যেমন মানুষের দাবী উঠছে, তেমনি পৃথিবীর শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোতে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু রাখার বিরুদ্ধেও আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে। অ্যামেরিকার থ্রি মাইল আয়ল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চের্নোবিল পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে সাম্প্রতিককালের দুর্ঘটনাগুলোকে এই আন্দোলনের কর্মীরা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন, যে জাতীয় দুর্ঘটনাজনিত তেজস্ক্রিয়তায় বহু মানুষের মৃত্যু ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকছে সব সময়েই।

পারমাণবিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও তো দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। এছাড়া রয়েছে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলোর তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টের নিরাপদ বিলিব্যবস্থার সমস্যা। এই উচ্ছিষ্টের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ প্লুটোনিয়াম, যা পটাসিয়াম সায়ানাইডের চেয়েও বহু হাজার গুণে বিষাক্ত। এক

কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়ামকে সমস্ত পৃথিবীর ৪৫০ কোটি মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিলেও প্রতিটি মানুষই তার বিষের প্রভাবে মারা যাবে।

সমস্যা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির কোন বিকল্পকেও তো এখনো পর্যন্ত দাঁড় করানো গেল না। পৃথিবীতে কয়লা ও খনিজ তেলের সঞ্চয় দ্রুতগতিতে নিঃশেষ হয়ে আসছে। সৌরশক্তি এবং অন্যান্য বিকল্প শক্তির উৎসকে ব্যবহারিক ভাবে কাজে লাগানোর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টাও এখনো প্রাথমিক স্তরে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ঠিকই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ঠেকা দেবার মত ব্যবস্থা তো হাতের নাগালের মধ্যে নেই—পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের প্রবক্তারা একথা বলছেন এবং তাদের যুক্তিকে তো সাধারণ বিচারে উপেক্ষাও করা যায় না। কাজেই পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তমূলক কোন বক্তব্যকে এখনই গ্রহণ করার ব্যাপারটা যে সত্যিই কঠিন, তা তো আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট ও মানুষের নিরাপত্তা

পৃথিবীতে একটি সমস্যা মানবজাতির পক্ষে ক্রমেই গুরুতর রূপ ধারণ করছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে যেসব দেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু করা হয়েছে, সেই শক্তিকেন্দ্রগুলির নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মধ্যে ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি নিঃশেষিত হবার পর যে উচ্ছিষ্ট জমা হচ্ছে, সেই উচ্ছিষ্টের নিরাপদভাবে বিলিব্যবস্থার সমস্যা। এই উচ্ছিষ্টের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যাদের অনেকেরই তেজস্ক্রিয়তা মারাত্মক অবস্থায় বজায় থাকবে প্রায় দশ হাজার বছর ধরে। মানুষের লোকালয়ের কাছাকাছি জমির ওপর বা জলে একে ফেলা যাবে না, সমস্ত প্রাণীজগতের অস্তিত্বই তাহলে বিপন্ন হয়ে উঠবে। ক্যান্সার থেকে শুরু করে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে মানুষ।

হিসেব করে দেখা হয়েছে, আগামী ২০০০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে এই তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় চার লক্ষ টন। বর্তমানে এদের সরিয়ে ফেলার জন্য যে ব্যবস্থাটা করা হয় তা হল এই—পনের হাজার থেকে এক লক্ষ গ্যালন আয়তনের ইস্পাতের তৈরি ট্যাঙ্কে তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের তরল অবস্থায় পুরে ভূগর্ভে প্রায় তিন মিটার নিচে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। এই ট্যাঙ্কগুলি এমনভাবে তৈরি যে ওতে কখনও মরচে ধরবে না এবং ধরে নেওয়া হয়েছে আগামী ছশ' বছর পর্যন্ত ওরা উচ্ছিষ্ট পদার্থগুলোর তেজস্ক্রিয়তাকে ভেতরেই ধরে রাখতে পারবে—বাইরে তা কোনমতেই নিঃসৃত হবে না। কিন্তু আদতে দেখা গেল, দশ পনের বছর যেতে না যেতেই এই ট্যাঙ্কগুলির বেশ কয়েকটি তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে শুরু

করল। ফলে বিশেষজ্ঞরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই আধারগুলিকে মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ কোন জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। সেই স্থান নির্বাচন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এতকাল জল্পনা-কল্পনা চলেছে। এ প্রসঙ্গেই আমরা কিছু আলোচনা করব।

তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট

পৃথিবী জুড়ে ক্রমবর্ধমান শিল্পব্যবস্থার ফলে নানা ধরনের শিল্পজাত উচ্ছিষ্ট তৈরি হচ্ছে বহুকাল ধরেই। এই শিল্পজাত উচ্ছিষ্টকে কঠিন, তরল, গ্যাসীয়—এই তিন রূপেই আমরা পাচ্ছি। এইসব উচ্ছিষ্টকে নির্বিচারে ফেলা হচ্ছে মাটিতে, জলে এবং বাতাসে। এর ফলে পৃথিবী জুড়ে ঘটছে মাটি, জল ও বায়ুদূষণ। শিল্পপ্রধান শহরের মানুষেরা বাতাস ও জল দূষণের ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের পক্ষে নিরাপদ রাখার একটা সমস্যা যেখানে আগে থেকেই ছিল, সেখানে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত এসে জুড়ে বসল আর একটি মারাত্মক সমস্যা তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের নিয়ে।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে যে তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের আমরা পাচ্ছি তাদের আকৃতিটা অন্য রকম। এদের যেমন কোন খারাপ গন্ধ নেই, তেমনি ধোঁয়ার মত এরা বাতাসকে দূষিতও করে না। কিন্তু রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি যেসব উপাদানকে আমরা এই উচ্ছিষ্টের মধ্যে পাই, এরা সব মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয়। এই তিনটি উপাদানই মারাত্মক অবস্থায় থাকে যথাক্রমে ৩২০০০, ৫ ও ১০ লক্ষ বছর ধরে। এদের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে এলে মানুষের দুরারোগ্য সব ব্যাধি ঘটতে পারে। তাই শিল্পজাত উচ্ছিষ্টের মত নির্বিচারে এদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কোনমতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে কঠিন ও তরল অবস্থায় নানা

ধরণের তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট তৈরি হয়। তরল উচ্ছিষ্টদের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। নিম্নমাত্রার উচ্ছিষ্টের তেজস্ক্রিয়তার মাপ হল থেকে ১ মাইক্রোকুরি পর্যন্ত। এক কুরি হল একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সেই পরিমাণ, প্রতি সেকেণ্ডে যা থেকে $৩\cdot৭ \times ১০^{১০}$ (১-এর পর ১০টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায়) পরিমাণ বিস্ফোরণ ঘটছে—এ হল তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয়প্রাপ্তির একটি হার।

আমরা জানি, প্রতিটি তেজস্ক্রিয় পদার্থই আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির আকারে ক্রমাগত ওদের ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে চলেছে। মাইক্রোকুরি হল এক কুরির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

নিম্নমানের তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের অত্যন্ত তরলীকৃত অবস্থায় নিরাপদ মাত্রায় নামিয়ে এনে বাইরের পরিবেশের মধ্যে (যেমন সমুদ্রের জলে) ফেলা যেতে পারে, যাতে প্রতি লিটার জলে যে কোন একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পরিমাণ দাঁড়ায় যৎসামান্য—যে পরিমাপটা সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে না।

মধ্যমাত্রার তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টের পরিমাপ হল এক মাইক্রোকুরি থেকে একশ' মাইক্রোকুরি পর্যন্ত—একেও অতি নিরাপদ মাত্রায় নামিয়ে এনে পরিবেশের মধ্যে বিলিব্যবস্থা বিশেষজ্ঞরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কিন্তু উচ্চ মাত্রার উচ্ছিষ্ট, যাদের তেজস্ক্রিয়তার মাপ হল একশ' কুরিরও বেশি, ওদের বিলিব্যবস্থা কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে করা যাবে না।

আমরা জানি, সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর শতকরা ৯৯·৩ ভাগ হল ওর একটি আইসোটোপ (সাধারণ পদার্থের সঙ্গে ওদের আইসোটোপদের রাসায়নিক বিচারে কোন তফাৎ নেই—তফাৎটা শুধু পারমাণবিক ভরের বেলায়) ইউ-২৩৮, আর মাত্র ০·৭ ভাগ হল আর একটি আইসোটোপ ইউ-২৩৫। একমাত্র ইউ-২৩৫-এর পরমাণুকেন্দ্রকের মধ্যেই বিভাজন ঘটান যায়, যার ফলে পরমাণুর

ভর রূপান্তরিত হবে শক্তিতে।

একটি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের মধ্যে সাধারণ ইউরেনিয়াম বা ইউ-২৩৫ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের দণ্ড বসান থাকে। ইউরেনিয়াম জ্বালানি হিসাবে যত ব্যবহৃত হতে থাকে, তত ওর জ্বালানি দণ্ডগুলির ওপর প্লুটোনিয়ামের একটি আইসোটোপ প্লুটো-২৩৯ তৈরি হতে থাকে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাজে এই প্লুটো-২৩৯ হল একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয়।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট থেকে প্রথমে প্লুটোনিয়ামকে আলাদা করে নিতে হবে—এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে রিপ্রসেসিং। এই পদ্ধতি যে দেশ আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে. তার পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা খুব বড় একটা সমস্যা নয়।

রেহাই পাবার ব্যবস্থা

উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের নিরাপদ বিলিব্যবস্থার পথে প্রথম ধাপটা হল তরল উচ্ছিষ্টকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করা। এজন্য ঐ উচ্ছিষ্টকে কাচ বা সেরামিক জাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় তপ্ত করা হয়। ঠাণ্ডা হবার পর মিশ্রিত বস্তুটি কঠিন রূপ ধারণ করে—এই পরম ঘনীভূত কঠিন বস্তুটিকে আর ভাঙ্গা যায় না। সমগ্র পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভেরিফিকেশন'। ভারতের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি থেকে যে তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট তৈরি হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এই ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছেন।

পারমাণবিক উচ্ছিষ্টকে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করার পরেও কিন্তু তার তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কাজ বন্ধ হয় না। কিন্তু কঠিন অবস্থায় কোন বস্তুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা অনেক সহজ এবং ভূগর্ভে যদি তাকে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেখানকার জলের কোন সঞ্চয়ের সঙ্গে ঘটনাক্রমে মিশ্রিত হবার সম্ভাবনাও কমে যায়।

এখন প্রশ্নটা হল, কোথায় এই তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টকে রাখা যাবে।

কঠিন অবস্থায় উচ্ছিষ্টকে রাখার জন্য দীর্ঘকালীন ব্যবস্থারূপে যে পদ্ধতিগুলির কথা ভাবা হয়েছিল, সেগুলি হল—১। ভূগর্ভের অনেক গভীরে বড় আকারের কোন গর্ত বা ফাটলের মধ্যে ইস্পাতের আধারে পুরে ওদের রাখা। ২। সাগরের গভীর তলদেশের ওপরে বা নিচে প্রোথিত করে রাখা। জাপানে এ ব্যাপারে কিছু পরীক্ষা-কাজ করা হয়েছে। ৩। বরফের দেশ সুমেরু বা কুমেরুতে এমন বরফের স্তূপের মধ্যে ওদের সঞ্চিত রাখা, সুদীর্ঘকালের মধ্যে যাদের গলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরফ গলে গেলে আধারগুলি সোজা সাগরের জলে এসে হাজির হবে। ৪। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের কাছাকাছি বা ভূপৃষ্ঠের ওপর বিশেষভাবে তৈরি আধারে ওদের রাখা। ৫। আধারগুলিকে ভূপৃষ্ঠের নিচে লবণের খনির মধ্যে নামিয়ে দেওয়া।

তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টের আধারগুলিকে ভূপৃষ্ঠের ১৬০ মিটার নিচে কোন অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যে যদি রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। এমন ধরনের শিলাস্তরকেই নির্বাচন করতে হবে, যারা বহু লক্ষ বছর ধরে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বহু লক্ষ বছর ধরে একই অবস্থায় থাকবে।

তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট ও লবণের খনি

বর্তমানে এ প্রসঙ্গে অ্যামেরিকায় যে পদ্ধতিটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, সেটি হল—বিশেষ বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় যেসব লবণের পর্বত রয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রায় দশ কিলোমিটার গভীর এবং পাঁচ কিলোমিটারের মত লম্বা, তাদের ভেতরে জায়গা তৈরি করে তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের কবরের ব্যবস্থা করা। বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর অতি প্রাচীন যুগে লবণাক্ত সমুদ্রগুলি বাষ্পীভূত হয়ে ওরা নাকি গড়ে উঠেছিল। লবণের পাহাড়ের মধ্যে যে লবণের ঘনত্ব ছিল কম, ওরা নিচেকার চাপে

ওপরে উঠে এসে একটি স্তূপ বা ডোমের আকারে লবণের পর্বতগুলির ওপর মাথা উঁচিয়ে ওঠে।

লবণের এই ডোম বা স্তূপগুলির ভেতরে ভূগর্ভের অনেক নিচে বিশেষ আধার তৈরি করে সেখানেই তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের রাখার একটি পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন লবণের স্তূপগুলি ভূতাত্ত্বিক বিচারে যথেষ্টই স্থিতিশীল। ওদের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থ কোন জলস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা নেই। কোন জলের ধারা কাছাকাছি থাকলে, লবণের স্তূপের মধ্যে যে অংশ জলে দ্রবণীয়, তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তেজস্ক্রিয় বস্তুর মধ্য থেকে নিঃসৃত তাপে লবণের স্তূপের মধ্যে যদি কোন ফাটলের সৃষ্টিও হয়, সেই ফাটল আপনা থেকেই বুজে আসবে—লবণের স্তরের এই বিশেষ ক্ষমতাটি গ্র্যানিট অথবা অন্য কোন আগ্নেয় শিলাস্তরের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞরা তো নিশ্চিতভাবেই বলেছেন যে ভূগর্ভে লবণের স্তূপ তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের তেজস্ক্রিয়তাকে খুব সহজেই এক জায়গায় সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারবে।

কাজের ব্যবস্থাটা হবে এরকম—কঠিন লবণের স্তরের মধ্যে লম্বভাবে একাধিক লম্বা নলকে প্রায় ৬০০ মিটার পর্যন্ত নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে। এই নলগুলির তলা থেকে অনেকগুলি সুড়ঙ্গ কাটা হবে অনুভূমিকভাবে (হরাইজন্টালি)। তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের বিশেষভাবে তৈরি ইস্পাতের আধারে পুরে ঐ সুড়ঙ্গগুলির মেঝের নিচে পুঁতে দেওয়া হবে। সমস্ত খনিটার ভেতরের ফাঁকা জায়গায় এবারে লবণ দিয়ে বোঝাই করে প্রবেশপথগুলির মুখ সেঁটে দেওয়া হবে বরাবরের মত। এ হল কয়লার খনি থেকে কয়লা বার করে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা বালি দিয়ে বোঝাই করে দেবার মত একটা ব্যবস্থা।

একমাত্র আশঙ্কার ব্যাপারটা হল এই, সুদীর্ঘকাল পরে যখন ঘটনাটার কথা সবাই হয়ত বিস্মৃত হয়ে আছে, এরকম কোন সময়ে কেউ হয়ত খনন কাজ করতে করতে আচমকা লবণের ডোমটার মধ্যে

প্রবেশ করে বসল। খোদ অ্যামেরিকাতেই এই বিশেষ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ জনমতের কিন্তু অভাব নেই।

স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা

তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টগুলির হাত থেকে যদি বরাবরের মত নিষ্কৃতি পেতে হয়, তাহলে যে দুটি পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটি হল ট্রান্সমিউটেসন পদ্ধতি। এ হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে উচ্ছিষ্টের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা বিকিরণ শোষণ করে নিয়ে এমন সব পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকবে, যাদের আদৌ ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। এইসব পদার্থেরা তেজস্ক্রিয় নাও হতে পারে, অথবা এমন একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থে এরা রূপান্তরিত হল যাদের অর্ধ-জীবনকাল (এ হল একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের জীবনে সেই সময়ের পরিমাপ, যার মধ্যে ওর তেজস্ক্রিয়তা ঠিক অর্ধেক পরিমাণে কমে আসে) খুবই কম এবং মানুষের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতাই এদের নেই।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হল তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টদের মহাকাশে চালান করে দিয়ে ওদের হাত থেকে স্থায়ীভাবে রেহাই পাওয়া। নানাভাবে কাজটা করা যেতে পারে—উচ্ছিষ্টদের রকেটের মাথায় চাপিয়ে সরাসরি সূর্যের ওপর ছুঁড়ে মারা যেতে পারে অথবা সৌরজগতের বাইরেও পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ দুটো ব্যাপারেই বৃহস্পতির অভিকর্ষ বলকে কাজে লাগাতে পারলে কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়। শুক্র অথবা মঙ্গল গ্রহের অভিকর্ষকে কাজে লাগিয়ে সূর্যের চারপাশে কোন একটি কক্ষপথে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে আধারটিকে। সূর্যের একটি কৃত্রিম গ্রহ হয়ে দাঁড়াবে তখন বস্তুটি। পৃথিবীর চারপাশে মহাকাশে কোন কক্ষপথেও পরিক্রমা করান যেতে পারে বস্তুটিকে। সূর্যের বুকে সরাসরি পাঠাবার মত যে শক্তিশালী রকেট ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা এখনও উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয় নি।

যে অভিনব মহাকাশযান স্পেস সাটলের সফল পরীক্ষাকাজ বর্তমানে সম্ভবপর হল, তার সাহায্যে আগামী ভবিষ্যতে যে কাজটা করা যেতে পারে, তা হল এই—বেশ কিছু বড় আধারকে মহাকাশে বয়ে নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় তেজস্ক্রিয় বস্তুদের ওদের মধ্যে এনে জমা করা। সাবধান হতে হবে একটা ব্যাপারে, রকেটের সমগ্র ক্ষেপণ-ব্যবস্থা যেন তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত থাকে।

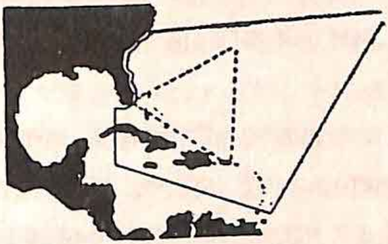
পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলির তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্টরা মারণাস্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে বসবে, যদি না এদের নিরাপদভাবে সরিয়ে রাখবার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা অবিলম্বে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এটা সম্ভবপর না হবার ফলে খোদ অ্যামেরিকাতেই গত তিন বছরে জনমতের চাপে কোন নতুন পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরি করা সম্ভবপর হয় নি। একই কারণের জন্যে ইয়োরোপের ছোট দেশ ডেনমার্ক ওর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলো আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল

একটি সাধারণ ঘটনার মধ্যে রহস্য রোমাঞ্চ এবং অলৌকিকত্ব আরোপ করার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই রয়েছে। একদল লোক এটাকেই উপজীব্য করে বিদেশে এবং আমাদের দেশে বেশ জাঁকিয়ে সায়েন্স ফিকসন লিখছেন। নীতিবোধের কোন বালাই এদের নেই। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার এবং কার্যকারণবাদের কোন প্রতিফলন এদের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, কিভাবে মানুষের মনের দুর্বলতা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে ভাঙ্গিয়ে তাকে উপজীব্য করে অর্থাগমের রাস্তাটাকে প্রশস্ত করা যায়। এ জাতীয় একটি বিষয় হল বারমুডা ট্র্যাঙ্গল। চার্লস বেরলিত্জ্ নামে জনৈক অ্যামেরিকান লেখক ১৯৭৫ সালে বিষয়টির ওপর একটি বই লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষের ওপর কপি বিক্রি হয়ে যায়। এই বইটিতে কিছু কিছু ঘটনাকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা থেকে সাধারণ পাঠকের মনে ধারণা জন্মাবে যে বারমুডা ট্র্যাঙ্গলরূপী অঞ্চলটি হল একটি বিরাট রহস্যময় এলাকা এবং এখানকার ঘটনাবলীর ওপর অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব রয়েছে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নামে জায়গাটির নামকরণের ব্যাপারটাই বিশেষভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মোটামুটিভাবে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল হল একটি ত্রিভুজাকৃতি এলাকা। এর একটি বাহু অ্যামেরিকার ফ্লোরিডা থেকে বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত, আর একটি বাহু বারমুডা থেকে পুয়ের্টোরিকো এবং তৃতীয় বাহুটি পুয়ের্টোরিকো থেকে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে ফ্লোরিডা পর্যন্ত বিস্তৃত। এলাকাটির আয়তন হল প্রায় চব্বিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এলাকাটির এই

নামকরণ এবং এভাবে চিহ্নিত করার পেছনেও একটি উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যটা আর কিছুই নয়, এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্য থেকেই সাগরের এই অঞ্চলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শয়তানের



বারমুডা ট্র্যাঙ্গল বা ত্রিভুজ। ভাঙ্গা লাইনে তৈরি ত্রিভুজটি হল প্রচলিত এলাকা। মোটা রেখার মধ্যে বৃহত্তর এলাকাটি গড়ে উঠেছে কল্প-কাহিনীকারদের লেখার মধ্য দিয়ে।

সমুদ্র', 'আতঙ্কের সমুদ্র', 'হারিয়ে যাওয়া জাহাজদের কবরখানা', 'বিদ্যুৎ ত্রিভুজ' ইত্যাদি। যে সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নামকরণ, সেই ঘটনাগুলোর চমকপ্রদ বর্ণনা থেকে প্রথম বিচারে মনে হবে ওরা নিতান্তই অলৌকিক।

কল্পকাহিনী

চার্লস বেরলিত্জ্ তাঁর বইতে দেখাচ্ছেন, ১৯৪৫ সালের আগে পর্যন্ত নাকি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় ৫০টির মত জাহাজ এবং ২৮টির মত বিমান নিখোঁজ হয়েছে এবং ১৯৪৫ সালের পর এই নিখোঁজের সংখ্যা হল ৮০টির মত। ঘটনাগুলো সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় রহস্যের ব্যাপারটা নাকি হল এই যে নিখোঁজ জাহাজ ও বিমানগুলোর কোন ধ্বংসাবশেষই যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ওদের যাত্রীদেরও দেহাবশেষের কোন সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকার বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রহস্যের জালকে বিস্তৃত করা হয়েছিল, তা কি মানুষের যুক্তিবিজ্ঞান এবং তর্কবিচারের বাইরে? যুক্তিনিষ্ঠ কিছু লেখক ও বুদ্ধিজীবী ইতিপূর্বে

ঘটনাগুলোর মধ্যে এক সুপরিকল্পিত মিথ্যাচারের জাল আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, যেমন বিবিসির প্রযোজক-লেখক গ্র্যাহাম ম্যাসি ও অ্যামেরিকার অ্যারিজোনার লাইব্রেরিয়ান-লেখক লরেন্স কুসে। এরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। এছাড়া অ্যামেরিকা ও সোবিয়েত ইউনিয়নের যুক্ত বৈজ্ঞানিক অভিযান পলিমোদের অবদানও এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর বর্ণনা আমাদের সন্দেহের উদ্রেক করে প্রধানত একটি কারণের জন্যে—ট্র্যাঙ্গলের ওপর লেখা প্রায় প্রতিটি বই এবং গল্পে ওদের বিবরণ হুবহু একই রকম। রহস্যের জালের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ভিনসেণ্ট গ্যাডিস নামে জনৈক ব্যক্তির লেখা ট্র্যাঙ্গলের ওপর একটি গল্পকে কেন্দ্র করে। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল আরগসি নামে একটি পত্রিকায়। তারপর বিষয়টির ওপর ব্যাঙের ছাতার মত গল্প এবং বই বিভিন্ন দেশে অসংখ্য পরিমাণে গজিয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

ট্র্যাঙ্গলের ওপর ঘটনাগুলো কিভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। গল্পকারদের বক্তব্য অনুযায়ী রাইফুকু মারু নামে একটি জাপানী তৈলবাহী জাহাজ ট্র্যাঙ্গল এলাকা থেকে একদিন একেবারেই লোপাট হয়ে যায়। অদৃশ্য হবার আগে একটি অদ্ভুত সংবাদ সে নাকি বেতারে পাঠায় "ছোরার মত শানিত বিপদ ঘনিয়ে উঠছে, তাড়াতাড়ি এসে বাঁচান।" আসলে এটা হল একেবারেই গল্প। গ্রাহক স্টেশনের রেডিও লগ বইতে আসল যে সঙ্কেতটি লেখা রয়েছে, তা হল এই— "এখন খুব বিপদ, তাড়াতাড়ি আসুন।" একটি জাহাজ এই বিপদ সঙ্কেত পাবার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে রাইফুকু মারু জাহাজটি প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে যাচ্ছে।

উইচক্রাফট নামে একটি কেবিন ক্রুজার ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে খুব শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেও নাকি ট্র্যাঙ্গল এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়—এটা ছিল প্রচারিত গল্প। অ্যামেরিকার কোস্ট-

গার্ড সংস্থার রেকর্ড বই থেকে দেখা যাচ্ছে, আসলে তখন ঘটনাস্থলে একটি ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। এছাড়া জাহাজটির নিজের সঠিক অবস্থান সম্বন্ধেও কোন ধারণা ছিল না এবং রেডিও সঙ্কেত মারফত ও জানায় যে জাহাজটির প্রপেলার ভেঙ্গে যাবার ফলে ও অসহায়ভাবে সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। গল্পকারদের বক্তব্য অনুযায়ী উইচক্রাফট জাহাজ থেকে শেষ সঙ্কেত যেটা পাওয়া তা নাকি হল এই—"এ রকমটা আগে কখন দেখি নি।" এরকম কোন কথার উল্লেখ অ্যামেরিকার কোস্ট গার্ড রেকর্ড বইতে নেই, যেটা পাওয়া যায় শুধু ট্র্যাঙ্গলের ওপর লেখা বইগুলোতেই।

গল্পকারদের আর একটি বর্ণনায় দেখা যায় ১৯৬৩ সালে দুটি জেট বিমান ট্র্যাঙ্গল এলাকা থেকে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দুটিরই ধ্বংসাবশেষ নাকি পাওয়া গিয়েছিল পরস্পরের কাছ থেকে কয়েক শ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে। যে উদ্ধারকারী দলকে ঘটনাস্থলে পাঠান হয়েছিল তাদের সংগৃহীত তথ্য ও সরকারি ভাষ্য থেকে অবশ্য জানা যাচ্ছে দুটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল একই জায়গায়। সরকারি সিদ্ধান্তটা ছিল এই, বিমানদুটো যেহেতু ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পরস্পরের খুব কাছে থেকে উড়ছিল তাই হঠাৎই কোনরকমভাবে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে ওরা ভেঙ্গে পড়ে।

ট্র্যাঙ্গল এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হল ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে অ্যামেরিকার নৌবাহিনীর পাঁচটি বিমানের নিখোঁজ হওয়া। এমন কথাও নাকি বলা হচ্ছে, এই ঘটনাটিকে বাদ দিলে বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের রহস্য নাকি কোনমতেই দানা বাঁধতে পারত না। বেরলিত্জ ও তাঁর প্রথম বই 'দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'উইদাউট এ ট্রেস' বই দুটোতে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এক অপার্থিব রহস্যজালকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ষোড়শোপচারে বর্ণনা করেছেন। গল্পকারদের বয়ান হল এই—অ্যামেরিকার নৌবাহিনীর ১৯ নম্বর ফ্লাইটের পাঁচটি অ্যাভেঞ্জার বোমারু বিমানের একটি দল ১৪ জন বৈমানিকসমেত ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর ফ্লোরিডার ফোর্ট

লডারডেল ন্যাভাল এয়ার বেস থেকে একটি রুটিনমাফিক শিক্ষামূলক মহড়ায় রওনা হয়। আবহাওয়া ছিল পরিষ্কার। বিমানবন্দরে অবতরণের পনের মিনিট আগে দলনেতা লেফটেনান্ট চার্লস টেলারের একটি আতঙ্কজনক সংবাদ পাওয়া গেল : "মনে হচ্ছে আমরা ভুল পথে চলেছি…জমির কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না…পশ্চিম দিক কোনটা তাও বুঝতে পারছি না…সবকিছুই মনে হচ্ছে ভুল, অদ্ভুত… এমনকি সমুদ্রের চেহারাও যেমনটা হওয়া উচিত তা দেখাচ্ছে না…মনে হচ্ছে আমরা যেন…।" বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ নাকি এখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপরেই নীরবতা।

নৌবাহিনার একটি বিমান তেরজন বৈমানিকসমেত উদ্ধার কাজের জন্য তক্ষুনি রওনা হল, কিন্তু হঠাৎ সেটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রায় তিনশ বিমান ও বিপুলসংখ্যক জাহাজ কয়েকদিনব্যাপী এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধান কাজ চালিয়েও ঐ ছটি বিমান ও সাতাশজন বৈমানিকের কোন চিহ্ন বা হদিশ খুঁজে পায় নি।

ট্র্যাঙ্গলের গল্প

এটা হল ট্র্যাঙ্গল-কাহিনীকারদের গল্প। কিন্তু এই গল্পের প্রায় প্রতিটি তথ্যই হল মিথ্যাচার ও অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট। প্রথম, টেলারের কাছ থেকে পাওয়া সেই অদ্ভুত সঙ্কেত, যার ওপর পুরো ট্র্যাঙ্গলের রহস্যটাই নাকি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি আদতে কখনই পাঠান হয় নি। যেসব বিমানবন্দরের সঙ্গে ১৯ নম্বর ফ্লাইটের যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল, তাদের একটিরও রেডিও লগবইতে এজাতীয় কথাবার্তা লিপিবদ্ধ নেই। বেতারের মাধ্যমে সমস্ত কথাবার্তাই ট্র্যাঙ্গল এলাকার অন্যান্য গল্পের মতই ভিনসেন্ট গ্যাডিসের আরগসিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে নেয়া। গ্যাডিসের বক্তব্য হল, তিনি নাকি একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে ঘটনাগুলো জেনেছিলেন। সেই সাংবাদিক কোন সূত্র থেকে ওদের পেয়েছিলেন, তা কিন্তু বলতে পারেন নি।

আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল দেখা যাক। গল্পকারদের বয়ান অনুযায়ী বিমানগুলো শান্ত আবহাওয়ায় বিকেল চারটে বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় নি বরং রাত সাতটার সময় সাগরের ওপর আবহাওয়ার চেহারা যখন ঝোড়ো হয়ে দাঁড়ায় তখনও ওরা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছিল। একমাত্র টেলার ছাড়া বৈমানিকদের মধ্যে আর কেউই অভিজ্ঞ বিমানচালক ছিলেন না। নৌবাহিনীর সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, টেলার তার ফ্লাইটের অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ফ্লোরিডার দক্ষিণে ফ্লোরিডা কিস নামে দ্বীপ-মালার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন, যেখানে আদতে তিনি যাচ্ছিলেন প্রায় একইরকম দেখতে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে। তিনি তাই লডারডেল বিমানবন্দরে ফিরে আসার জন্যে তাঁর হিসেব মত উত্তর পূর্বদিকে সমস্ত দলটির গতিপথ নির্দিষ্ট করলেন। এই ভুল পথ নির্বাচনের জন্যে টেলার ও উনিশ নম্বর ফ্লাইট সোজা গিয়ে হাজির হল অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে। তেল ফুরিয়ে যাবার পর স্বভাবতই বিমানগুলো রাত্রিবেলা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর ভেঙ্গে পড়ে। বিমান-গুলোর মধ্যে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত ওরা জলের ওপর ভেসে থাকতে পারত। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কয়েক ঘণ্টা বাদে যে অনুসন্ধানকারী দল পাঠান হয়েছিল ওরা বিমানগুলোর কোন চিহ্নই দেখতে পায় নি।

প্রথম যে উদ্ধারকারী বিমানটি পাঠান হয়েছিল, তার মধ্যে এত বেশি জ্বালানি ছিল যে সামান্য একটি বৈদ্যুতিক স্পার্ক ঘটলেই ওর মধ্যে আগুন ধরে যাবার কথা। আদতে বিমানবন্দরের র‍্যাডারের সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাগরে অবস্থানকারী একটি জাহাজ বিমানটির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখে। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, তেলের ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গিয়ে বিমানটি ধ্বংস হয়।

বেরলিতজের বইটি বেরোবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লরেন্স কুসে

'দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল : মিস্ট্রি সলভ্‌ড্‌' নামে একটি বই লেখেন। এই বইটিতে কুসে ট্র্যাঙ্গল এলাকার পঞ্চাশটির ওপর জাহাজের রহস্যকে একটির পর একটি তুলে ধরেন এবং জোরালো প্রমাণ ও নথিপত্রের মাধ্যমে দেখান ওই প্রতিটি রহস্য কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তথ্যের পরিবেশন, তথ্যের বিকৃতি এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর। কুসের বই থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের পুরো রহস্যের ব্যাপারটাই হল এক সুপরিকল্পিত মিথ্যার জাল, যাকে ভাঙ্গিয়ে বিদেশে এবং আমাদের দেশেও বেশ কিছু লেখক বই বিক্রির ব্যবসা ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন।

খুব সরল সত্য কথাটা হল এই, বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় জাহাজডুবি বা বিমান হারানর ঘটনার মধ্যে বিশেষত্ব আদৌ কিছু নেই। এই নিরুদ্দেশের ঘটনাগুলো অন্যান্য এলাকার তুলনায় আবার এখানেই যে বেশি পরিমাণে ঘটছে, ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তা নয়। অ্যামেরিকার সপ্তম কোস্টগার্ড ডিস্ট্রিক্ট্ সংস্থা লয়েডস অফ লণ্ডনের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৫ সালে অ্যামেরিকার উপকূলের কাছাকাছি বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যে একুশটি জাহাজডুবি হয়, তার মধ্যে চারটি মাত্র ডোবে ট্র্যাঙ্গল এলাকায়। ১৯৭৬ সালে এ জাতীয় আঠাশটি জাহাজডুবির মধ্যে মাত্র ছটি ঘটে ট্র্যাঙ্গল এলাকায়। সাগরের একটি অতিব্যস্ত পথে এত কম জাহাজডুবির ঘটনা খুবই বিস্ময়জনক, কারণ জাহাজ চলাচলের সংখ্যা এখানে খুবই বেশি, বছরে প্রায় দেড় লক্ষের কাছাকাছি।

বাস্তব ঘটনা

ট্র্যাঙ্গল এলাকায় জাহাজ বা বিমান নিখোঁজের ঘটনার পেছনে সঙ্গত কারণ কি থাকতে পারে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা অনুসন্ধান করেছেন। দেখা যাচ্ছে, এই এলাকায় চৌম্বক কম্পাসের কাঁটা উত্তর চৌম্বক মেরুর বদলে ভৌগোলিক উত্তর মেরুর দিকে নির্দেশ করে

থাকে। তাই পৃথিবী পরিক্রমার সময় একটি বিমান বা জাহাজের কম্পাসের কাঁটা তার সঠিক অবস্থান থেকে প্রায় কুড়ি ডিগ্রির মত ব্যবধান রচনা করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে সাগরগর্ভস্থ পর্বত-শ্রেণীর শিলাস্তরের মধ্যে বিপুল পরিমাণে চৌম্বক বস্তুর অবস্থানই নাকি এর মূলে। এই বিচ্যুতিটুকু যদি হিসেবের মধ্যে না ধরা হয়, তাহলে নৌ বা বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে গুরুতর বিপদ ঘনিয়ে উঠবে।

এই অঞ্চলে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে। ক্যারেবিয়ান উপসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উদ্দাম আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি হঠাৎ সামুদ্রিক ঝড় বা জলস্তম্ভকে তৈরি করে বসে। এই এলাকার সাগরগর্ভের ভূ-প্রকৃতির গঠনও জটিল—সাগরগর্ভস্থ পাহাড়ের মধ্যে বিস্তৃত গুহার সারি এবং গভীর ফাটল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিস্তৃত বালুর স্তূপ।

এই এলাকার মধ্যেই রয়েছে সারগাসো সমুদ্র—বিক্ষুব্ধ অ্যাট-লান্টিকের মধ্যে এক শান্ত জলরাশি। সামুদ্রিক আগাছা সারগাস্থম এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, সে থেকে এই নাম। শান্ত জলরাশি ও বিক্ষুব্ধ সাগরস্রোতের সংঘাত যেখানে সৃষ্টি হয়, সে জায়গার আবহাওয়াও যখন তখন বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকার বিপদসঙ্কুল আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী জীর্ণদশাগ্রস্ত জাহাজ এই এলাকায় নিয়ে এসে ডুবিয়ে দেয় এবং তারপর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসে। এজাতীয় প্রতারণার বেশ কিছু ঘটনা যেমন বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় ধরা পড়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলেও।

১৯৭৭-৭৮ সালে সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-অ্যামেরিকান পলিমোদে পরিকল্পনার অন্যতম কর্মসূচী ছিল বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় সাগরে আদৌ কোন রহস্য আছে কিনা অনুসন্ধান করা। এই অনুসন্ধানের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হল—এই এলাকায় অলৌকিক ঘটনাবলীর আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই। ওখানে

যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে তার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জাহাজ চলাচলের ব্যাপার আর প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে জোরাল সমুদ্রস্রোত এবং ঘূর্ণিপাক। প্রধানত এই কারণের জন্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ বা বিমানদের অবশেষ দ্রুতগতিতে সাগরগর্ভে মিলিয়ে যায়।

অতি সাধারণ একটি ঘটনার ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করে কি চমৎকার প্রতারণার এক পরিকল্পনা ফাঁদা যায়, বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের ঘটনা হল তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

উড়ন্ত চাকী : রহস্য ও সত্য

আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস, ইউ এফ ও। ফ্লাইং সসার্স। অজ্ঞাতনামা উড়ন্ত বস্তু, উড়ন্ত চাকী। এই কথাগুলোর মধ্যেই এক বিচিত্র অজ্ঞাতনামা রহস্যের হাতছানি রয়েছে যেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে উড়ন্ত বস্তু বা ইউ এফ ও বা উড়ন্ত চাকীর সব রহস্যের জালই আজ কিন্তু ছিন্ন। তবুও বিদেশে এবং আমাদের দেশে সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান জাতীয় রচনার মাধ্যমে বেশ কিছু লেখক মাকড়সার মত এই রহস্যের জাল আজও বুনেই চলেছেন। তাঁদের কোন শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্কের কোন ধার তারা ধারেন না। বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রতি তারা অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন! তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি সাধারণ মানুষের যে একটি আকর্ষণ রয়েছে, তাকে ভাঙ্গিয়ে দু' পয়সা কামানো, লোক ঠকাবার অতি সস্তা ব্যবসাকে বজায় রাখা।

অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুরা আসলে কি ? অন্য সৌরজগতের কোন গ্রহ থেকে পাঠানো বুদ্ধিমান সভ্যতার দূত, যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করতে চাইছে ? অথবা এই পৃথিবীরই সাধারণ প্রাকৃতিক বা বস্তুজাগতিক ঘটনাবলী, যারা সঠিকভাবে বোধগম্য না হবার ফলেই উড়ন্ত চাকীরূপী রহস্যের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বসে আছে। এ প্রবন্ধে উড়ন্ত চাকী সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিষয়টিকে সঠিক-ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করব।

ঘটনার শুরু হল

উড়ন্ত চাকীর আধুনিক যুগ শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন। দিনটি ছিল যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ও তপ্ত। কেনিথ আর্নল্ড নামে এক কোম্পানি সেলসম্যান একটি প্রাইভেট বিমানে চড়ে ওয়াশিংটন স্টেটের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাড়ি জমাচ্ছিলেন। আর্নল্ড কখনও উড়ন্ত চাকী সম্বন্ধে কিছুই শোনেন নি, স্বভাবতই এ সম্বন্ধে তার আদৌ কোন আগ্রহ থাকবারও কথা নয়।

বিকেল তিনটে নাগাদ আর্নল্ড আকাশে হঠাৎ একটি উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন। তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন বিচিত্রদর্শন বিমানের মত দেখতে নটি বস্তু একটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। মনে হল ওরা রয়েছে ২০ থেকে ২৫ কিলো-মিটার দূরে, ৯৫০০ মিটার উঁচু দিয়ে ওরা উড়ছিল এবং এক অবিশ্বাস্য বেগে ওরা ছুটছিল—আর্নল্ডের মনে হয়েছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার। ১৯৪৭ সালে পরিচিত যে কোন বিমানের তুলনায় যে বেগ ছিল প্রায় তিনগুণ বেশি। আর্নল্ডের দৃষ্টির সামনেই রূপালী চাকতিগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। চাকতিগুলোকে আর একবার দেখার বৃথা চেষ্টা করে আর্নল্ড তার গন্তব্যস্থলের দিকে উড়ে চললেন।

আর্নল্ডের বর্ণনা সমস্ত মহলেই এক বিরাট উত্তেজনাকে সৃষ্টি করল। সারা অ্যামেরিকা জুড়ে খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকাগুলো নটি রূপালী চাকতি সম্বন্ধে অজস্র কাহিনী প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একেবারে মেতে উঠল। বস্তুগুলোকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'উড়ন্ত চাকী'।

কেউ কেউ সমস্ত ব্যাপারটাকেই একেবারে উড়িয়ে দিলেন, আবার কেউ বললেন, ওরা অ্যামেরিকা অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষামূলক কোন গোপন অস্ত্রও হতে পারে। কেউ কেউ বললেন, অন্য কোন গ্রহ থেকে আগন্তুক মহাকাশযানও হতে পারে ওরা।

মার্কিন সামরিক বিভাগ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ঘটনাটার

অনুসন্ধান কাজ শুরু করলেন। তাঁরা বললেন, চাকতিগুলো সাধারণ জাতের কোন বিমান নয়। ওরা গোপনীয়ভাবে পরীক্ষাধীন কোন নতুন জাতের বিমান অথবা অস্ত্রও নয়। অনেক তত্ত্বতালাস করে অবশেষে বিশেষজ্ঞেরা মতামত দিলেন, কেনিথ আর্নল্ড আসলে দেখেছিলেন একটি মরীচিকাকে—বায়ুমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে যা গড়ে উঠেছিল।

বর্ণনার বৈচিত্র্য

আকাশে চাকতি অথবা অন্য কোন বিচিত্র বস্তুর দর্শক ইতিহাসে কেনিথ আর্নল্ড ছাড়াও আরও অনেকে রয়েছে। তিন হাজার বছরেরও পুরনো লিখিত নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, সে যুগেও অনেকে নাকি আকাশে রহস্যজনক উড়ন্ত সব বস্তুদের দেখেছেন। বাইবেলে যে উজ্জ্বল আলো, জ্যোতির্ময় রথ এবং বিচিত্রদর্শন মেঘেদের উল্লেখ পাওয়া যায় তা আকাশে গতিশীল অস্বাভাবিক সব বস্তুদের দর্শন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেণ্টে সাধু এজেকায়েল একটি মেঘ এবং আগুনের গোলকের আত্মপ্রকাশের বর্ণনা দিচ্ছেন—উত্তর দিক থেকে এটিকে তিনি বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মগ্রন্থগুলোতে যে উড়ন্ত দেবতা এবং আকাশযানের কথা ও অগ্নিময় রথে দেবতাদের পৃথিবীতে নেমে আসার বর্ণনা রয়েছে, তা আকাশে উড়ন্ত চাকী জাতীয় বিচিত্র সব বস্তুদের কথাই হয়ত উল্লেখ করছে—কিছু কিছু লেখক এমন কথাও বলে বসলেন।

খ্রীষ্ট যুগ শুরু হবার আগে রোমানরা আকাশে পশ্চিম থেকে পূর্বে একটি গোলাকৃতি বস্তুকে গতিশীল হতে দেখেছিল, যাকে দেখাচ্ছিল একটি গ্লোব অথবা ঢালের মত। বিভিন্ন জায়গা থেকে এ জাতীয় আরও বেশ কিছু বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে।

যেহেতু এই রহস্যজনক দৃশ্যগুলো অনেক পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাই এদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রোমানরা হয়ত আসলে উত্তরাকাশের

আলো, উজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা উল্কাজাতীয় কোন বস্তুকে দেখেছিল, যেগুলো যুগে যুগে পুনরুক্তির মাধ্যমে জ্বলন্ত গোলক, জাহাজ অথবা ঢালের বর্ণনায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, মধ্যযুগে রিপোর্টিংয়ের ব্যাপারটা যখন আরও উন্নত হল, এ ধরনের ঘটনার কথা আমরা আরও বেশি শুনতে পেলাম। ঘটনার ক্ষেত্র এখন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালি, স্কটল্যাণ্ড, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। বর্ণনার ধরনটা ছিল এরকম—একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। আবার কেউ বা দেখছে একটি উজ্জ্বল নৌকাকে, কেউ বা দেখছে একাধিক উজ্জ্বল বস্তু বা মেঘপুঞ্জকে বা একটি সিলিণ্ডার আকৃতির বস্তুকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে অ্যামেরিকার বিভিন্ন জায়গায় অদ্ভুতদর্শন সব বস্তুর আকাশপথে বিচরণের খবর আসতে শুরু করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর এক ধরনের রহস্যের খবর পাওয়া গেল। ১৯৪৪ সালে ইংরেজ ও অ্যামেরিকান বিমানচালকেরা জার্মানির ওপর বিমানহানার সময় অদ্ভুত আকারের আগুনের সব গোলক দেখতে পাচ্ছিল। কখনও এককভাবে কখনও পনের কুড়িটি দলবদ্ধভাবে ওরা আবির্ভূত হত এবং মিত্রপক্ষের বিমানগুলোর প্রায় ডানা ছুঁয়ে অথবা খানিকটা দূরে থেকে অনুসরণ করত। ১৯৪৪ সালে জার্মানি নাকি মরীয়া হয়ে পরাজয় এড়াবার জন্যে এক গোপন অস্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মিত্রপক্ষের বিমানচালকেরা মনে করছিল, ঐ জাতীয় কোন অস্ত্রের সঙ্গেই তাদের পরিচয় ঘটছে। যেহেতু তথাকথিত অস্ত্রগুলোর সঙ্গে ওদের কোন সংঘাত ঘটছিল না, তাই ওরা ধরেই নিয়েছিল মিত্রপক্ষের র‍্যাডার অথবা বিমানের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার জন্যেই এই কাণ্ডটা শত্রুপক্ষ করছে। ওদের নাম দিয়েছিল তারা ফু-ফাইটার।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের ওপর হানাদার মিত্রপক্ষের বিমান-চালকদের কাছ থেকেও এই একই রকমের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল।

যুদ্ধের পর গোয়েন্দা দফতরের অনুসন্ধানে জানা গেল যে জার্মান ও জাপানী বিমানচালকদেরও ফু-ফাইটারের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল এবং ওরাও ভেবেছিল সেগুলো ছিল শত্রুপক্ষের কোন গোপন অস্ত্র।

রোমাঞ্চকর ঘটনা

উড়ন্ত চাকীর ইতিহাসে যে তিনটি ঘটনাকে প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে তাদের মধ্যে একটি ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে। ঘটনাস্থল হল অ্যামেরিকার কেনটাকি প্রদেশের মেসভিল শহর। ঐদিন কয়েকজন ব্যক্তি শহরের ওপর দিয়ে একটি অদ্ভুতদর্শন বিমানকে উড়ে যেতে দেখে। ওরা রাষ্ট্রীয় হাইওয়ে পেট্রোলকে জানাল ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে, যারা আবার নিকটবর্তী গডম্যান বিমানবাহিনী কেন্দ্রের কাছে একই ব্যাপারের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হল।

হাইওয়ে পেট্রোল খানিক বাদে জানাল ওরা বস্তুটিকে দেখতে পেয়েছে—একটি গোলাকার উজ্জ্বল বস্তু, ব্যাস সম্ভবত ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার, মনে হচ্ছিল ওটা যেন ধাতু দিয়ে তৈরি। গডম্যান বিমানবাহিনী কেন্দ্র থেকেও বস্তুটিকে খানিক বাদে দেখা গেল।

চারটি এফ-৫১ বিমান ক্যাপ্টেন টমাস ম্যান্টেলের নেতৃত্বে গডম্যানের দিকে এগিয়ে আসছিল। গডম্যান বিমানকেন্দ্রের কর্মীরা ম্যান্টেলকে অনুরোধ করল তিনি যদি বস্তুটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে বিশদভাবে ওদের জানান। ম্যান্টেল রাজি হলেন এবং বস্তুটির সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। প্রায় ৩০০০ মিটার ওপরে ওঠার পর ম্যান্টেল জানালেন তিনি বস্তুটিকে সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। কয়েক সেকেণ্ড বাদে আবার জানালেন, আরো ২০০০ মিটার ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন তিনি। এফ-৫১ বিমানে অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল না—যার প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৫০০০ মিটার ওপরেই। ম্যান্টেলের সঙ্গে এরপর বিমানকেন্দ্রের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঐদিন অপরাহ্নে একটি অনুসন্ধানকারী বিমান

গডম্যান থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে একটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। ঐটিই ছিল ক্যাপ্টেন ম্যাণ্টেলের এফ-৫১ বিমান। বিমানের চালক তখন মৃত।

যখন জানা গেল, ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটি একটি বিচিত্রদর্শন বস্তুর সন্ধান করছিল, তখন নানা ধরনের গুজব ছড়াতে শুরু করল। যেমন, ম্যাণ্টেল ঐ রহস্যজনক বস্তুটির খুব কাছাকাছি যাবার ফলেই বিমানটি ধ্বংস হয়ে যায়, ম্যাণ্টেলের দেহকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি, একটি মহাকাশযানের আরোহীরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে, বিমানচালকের দেহ পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জুড়ে ছিল রহস্যজনক রকম সব ফুটো।

ঘটনাটি অনুসন্ধানের জন্যে মার্কিন বিমানবাহিনী থেকে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট ছিল এই—ম্যাণ্টেল অক্সিজেন ছাড়া অনেক বেশি উঁচুতে ওঠার ফলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং ওর বিমানটি নিয়ন্ত্রণের অভাবে খাড়া নেমে এসে মাটিতে আছড়ে পড়ে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। ম্যাণ্টেল কিসের পেছনে ছুটছিলেন ? 'এয়ার টেকনিক্যাল ইনটেলিজেন্স সেণ্টার' থেকে বলা হল, ম্যাণ্টেল শুক্রগ্রহকে দেখেছিলেন এবং তারই পেছনে ছুটছিলেন। পরে আবার বলা হল, একটি স্কাইহুক বেলুন হয়ত তিনি দেখেছিলেন। আবার অনেকে বললেন, একজন অভিজ্ঞ বিমানচালকের পক্ষে কি এত বড় একটা ভুল করা সম্ভবপর? সে যাইহোক, ম্যাণ্টেলের ঘটনাটির পুরো রহস্যের সমাধান করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি।

তথ্য সংগ্রহের প্রকল্প

১৯৪৮ সালে অ্যামেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠাণ্ডা লড়াই তুঙ্গে পৌঁছেছিল। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু বলে যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে, তারা হয়ত গোপন সোভিয়েত অস্ত্রও হতে পারে। আবার অন্তগ্রহ বা আন্তর্নাক্ষত্রিক কোন ক্ষেত্র থেকেও কি ওরা এসে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও তোলা হল। সমগ্র ব্যাপারটি

অনুসন্ধানের জন্যে মার্কিন বিমানবাহিনী থেকে ১৯৪৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 'প্রোজেক্ট সাইন' নামে একটি প্রকল্পকে গ্রহণ করা হল। পরে এর নাম পাল্টে রাখা হয়েছিল 'প্রোজেক্ট গ্রাজ'। এই প্রকল্প থেকে ২৪৪টির মত অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়।

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে প্রজেক্ট গ্রাজ-এর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হল, তা থেকে বোঝা গেল, দৃষ্ট বস্তুগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ না করতে পারার জন্যেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। শতকরা বত্রিশ ভাগের মত ঘটনার পেছনে ছিল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কিছু ব্যাপার, শতকরা ৩০ ভাগ ঘটনার পেছনে ছিল আবহাওয়া বেলুন, শতকরা তেত্রিশ ভাগের মূলে ছিল বিমান অথবা এমন কিছু ব্যাপার, যার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রকল্পের মূল সিদ্ধান্তটা ছিল এই— "অনুসন্ধানের মাধ্যমে এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে ওরা হল কোন বিদেশী উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক বস্তু। তাই জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওরা কোন বিপদকেও সূচিত করে তুলছে না।"

বিজ্ঞানের বিচারে

বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উড়ন্ত চাকী প্রসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত কি ধরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাক। বিদ্যুৎবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ফিলিপ প্লাসের মতে এজাতীয় বেশির ভাগ ঘটনার মূলে রয়েছে প্লাজমা। প্লাজমা হল তড়িতাবিষ্ট উজ্জ্বল গ্যাসীয় অণুদের সমষ্টি। আকাশে তড়িতাবিষ্ট একটি মেঘস্তর থেকে আর একটি মেঘস্তর পর্যন্ত ঝড়ঝঞ্ঝার সময় যে বিদ্যুতের ঝলকানি আমরা দেখতে পাই তাও হল এক ধরনের প্লাজমা। হাই-টেনশন বৈদ্যুতিক তারের ওপরেও প্লাজমা তৈরি হয়, বিশেষ করে যখন ওই তার এবং ওদের অন্তরক (ইনস্যুলেটর) বস্তুরা ধুলো অথবা লবণজাতীয় পদার্থের আস্তরণের দ্বারা ঢাকা পড়ে। বিশেষজ্ঞেরা এজাতীয় তড়িৎমোক্ষণের নাম দিয়েছেন 'পাওয়ার লাইন করোনা'।

একটি বিমান যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে চলে, ওর দেহের ওপর বৈদ্যুতিক চার্জ জড়ো হতে পারে। ঐ চার্জ যখন মোক্ষণের মাধ্যমে ছাড়া পায়, তখন তাকে দেখায় একটি আগুনের গোলকের মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ফু-ফাইটারদের কথা শোনা গিয়েছিল (যে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি), তারা সম্ভবত ছিল এ জাতীয় প্লাজমা।

ডোনাল্ড মেনজেল হলেন একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থবিদ। উড়ন্ত চাকীর ব্যাপারে তিনিও যথেষ্ট অনুসন্ধান কাজ করেছেন। তাঁর মতে বেশির ভাগ রিপোর্টের মূলে যে বিভ্রান্তি, তার কারণ হল দ্রষ্টার আসল ঘটনাটিকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারা। মেনজেল, লাইল জি রয়েডের সঙ্গে মিলিতভাবে 'দি ওয়ার্ল্ড অফ ফ্লাইং সসার্স' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে এ জাতীয় বহু ঘটনার কথা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি ঘটনার নাম দিয়েছেন 'ফ্লাইং বার্ড কেজ'।

অ্যামেরিকার মিসিগানে এক দম্পতি একদিন রাত্রিবেলা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখলেন একটি বিচিত্রদর্শন বস্তু রাস্তা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ভেসে রয়েছে। ওর চেহারাটা দেখাচ্ছিল একটি পাখির খাঁচার মত, ব্যাস ছিল ৭ থেকে ১০ মিটারের মত এবং জমির ৭০ মিটার ওপর দিয়ে জমির সমান্তরাল ভাবে ও ভেসে চলেছিল। আবছা হলুদ বর্ণের আলোয় বস্তুটির আপাদমস্তক দেখাচ্ছিল খুবই উজ্জ্বল। প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তা পাল্লা দিয়ে চলার পর উড়ন্ত চাকীটির হলদে আলোগুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে এল এবং এবারে ওর তলার দিকে লাল আলোর একটি বৃত্ত জেগে উঠল। এরপর বস্তুটি খুব দ্রুতবেগে ওপরের দিকে উঠে মিলিয়ে গেল।

বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করে ঘটনাটি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেল, তাতে উড়ন্ত চাকীর ভক্তরা নিতান্তই হতাশ হলেন। অপরাধী দেখা গেল আর কেউ নয়—মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার দূরবীন

যন্ত্রটি। দূরবীনটির ৮৫ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ডিসের তলায় তারের জালের একটি গঠনের জন্যে ওকে দেখাচ্ছিল একটি পাখির খাঁচার মত। দম্পতিটি যখন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দূরবীনের ডিসটি দিগন্ত থেকে একেবারে মাথার ওপরের আকাশ পর্যন্ত এলাকাকে অনুসন্ধান করে চলেছিল। ওপরের দিকে ঘোরার সময় ওর হলদে আলোগুলো ধীরে ধীরে আড়াল পড়ে যায়। লাল আলোগুলো বসান ছিল একটি রেডিও টাওয়ারের ওপর—দূরবীন ও দম্পতিরূপী দর্শকদের মাঝামাঝি জায়গায়। জ্যোতির্বিদরা যখন তাঁদের রাতের কাজ শেষ করে দূরবীনের সংলগ্ন ফ্লাডলাইটগুলো নিবিয়ে দিলেন, তখন প্রহেলিকার পাত্রটি পূর্ণ হল—উড়ন্ত চাকিটি ওর আলো হলদে থেকে লাল রঙে পালটে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উড়ন্ত পাখীর খাঁচারূপী ঘটনাটির রহস্যের সমাধান বিশেষজ্ঞেরা তাড়াতাড়িই করতে পেরেছিলেন। কখনও কখনও আবার একটি উড়ন্ত চাকীর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা কাজটা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু নির্ভরযোগ্য তথ্য যেটুকু পাওয়া গেল, তা হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় খুবই স্বল্প। তা সত্ত্বেও ডঃ মেনজেলের মত হল এই, উপযুক্ত পরিমাণ তথ্য পাওয়া গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অজ্ঞাতনামা উড়ন্ত বস্তু বা উড়ন্ত চাকীরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত সাধারণ বস্তুরা ছাড়া আর কিছু নয়। হয়ত ওদের দেখা গিয়েছিল এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অথবা ওরা ছিল একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনারই এমন কোন পরিণতি যার সঙ্গে দ্রষ্টারূপী ব্যক্তিটি পরিচিত নন।

ফিলিপ প্লাস এবং মেনজেল দুজনেই নিশ্চিতভাবে বলছেন, উড়ন্ত চাকীরা পৃথিবীর বাইরে কোন সভ্যতা কর্তৃক প্রেরিত দূত নয়। আগামী ভবিষ্যতে পৃথিবীতে অন্য সৌরজগতের কোন গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান অতিথিদের আগমনের সম্ভাবনাকে তাঁরা খুব খোলা মনেই বিচার করে দেখছেন। এ সম্ভাবনা রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের মতে এজাতীয় কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। উড়ন্ত চাকীর

প্রেমিকদের বক্তব্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁরা তাই একমত হতে পারছেন না।

কলোরাডো প্রকল্প

১৯৬৬ সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় অজ্ঞাতনামা উড়ন্ত বস্তু সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি সর্বাত্মক অনুসন্ধান কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েকটি বিশেষ ঘটনাকে এ কাজের জন্যে তাঁরা বেছে নেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড কনডনের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী কাজ শুরু করেন। এ ছাড়া আরও ঠিক হয়, অ্যামেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' কলোরাডো প্রকল্পের অনুসন্ধানের রিপোর্ট খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবেন। এতে এ রিপোর্টের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কলোরাডো প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা দু বছর ধরে শত শত উড়ন্ত চাকী সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়ে অনুসন্ধান করে চলেন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলোরাডো প্রোজেক্ট 'সায়েন্টিফিক স্টাডিজ অফ আন-আইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস' নামে ১৪৬৫ পাতার এক দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করা ছাড়াও এই প্রকল্প উড়ন্ত চাকী সংক্রান্ত নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক ও টেকনি-ক্যাল তথ্যও খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের একেবারে গোড়াতেই ডঃ কনডন তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, যার মোদ্দা কথাটা ছিল এই: "আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে গত একুশ বছর ধরে অজ্ঞাতনামা উড়ন্ত বস্তু সংক্রান্ত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন বিশেষ কিছুই জমা পড়েনি। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান কাজের আদৌ কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করি না।"

কলোরাডো প্রকল্প 'অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুর' অস্তিত্বে অস্বীকার করছেন না। কিন্তু আন্তগ্রহ বা আন্তর্নাক্ষত্রিক অঞ্চল থেকে ওরা

আসেনি কারণ তার মূলে আদৌ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, এটাই তাঁদের বক্তব্য। এই পৃথিবীরই বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রাকৃতিক ও বস্তুজাগতিক ঘটনাকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারার ফলে বা ভুল ভাবে বোঝার জন্যে উড়ন্ত চাকীরূপী ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ব্লু বুক প্রকল্পেরও বক্তব্য ছিল মোটামুটি একই রকম।

উড়ন্ত চাকীপ্রেমীরা অবশ্য এই রিপোর্টে স্বভাবতই খুশি হতে পারেন নি। সমগ্র ঘটনাটিকে ঘিরে এক রহস্যের জাল তাঁরা ছড়িয়ে রাখতে চান। তাঁদের বক্তব্য, ওরা হচ্ছে অন্য গ্রহলোকের সভ্যতা প্রেরিত দূত। এ ব্যাপারে তাঁদের নেতা হচ্ছেন এরিক ফন দানিকেন। দানিকেন তাঁর 'ওয়াজ গড অ্যান অ্যাস্ট্রোনট ?" গ্রন্থে দাবি করছেন যে মহাকাশচারীরা অন্য জগত থেকে শুধু যে বাইবেলের যুগে আমাদের পৃথিবীতে এসেছিলেন তাই নয়, তার আগেও এসেছিলেন।

উড়ন্ত চাকীর ভক্তরা

উড়ন্ত চাকীর ভক্তরা বিভিন্ন দেশে নিজেদের সমিতি গঠন করেছেন। তাঁরা প্রায় একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতই আচরণবিধি অনুসরণ করে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য, উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা মাঝে মাঝে উড়ন্ত চাকীরূপী দূত পাঠিয়ে আমাদের কাজকর্মের ওপর খবরদারী বজায় রাখছেন। বিজ্ঞানের অপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন সব মারণাস্ত্র আমরা তৈরি করেছি, যাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এক বিধ্বংসী কাজের মধ্য দিয়ে যদি আমরা রসাতলের দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে ঐ উন্নত সভ্যতার দূতরা পরম বন্ধুর মত আমাদের রক্ষা করবেন, বাঁচার পথের নির্দেশ দেবেন।

পৃথিবীর বাইরে আমাদেরই তারাজগত ছায়াপথের মধ্যে এমন অসংখ্য পৃথিবী জাতের গ্রহ আছে, যেখানে মানুষের মত উন্নত প্রাণী ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। হয়ত এ জাতীয় অনেক সভ্যতার মান আমাদের চেয়েও উন্নত। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই এটা স্থিরভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঐ সভ্যতার অধিকারীরা আমাদের সৌরজগতের অন্য

কোন গ্রহে নেই। তাঁরা রয়েছেন এমন এক অসীম দূরত্বে যার পরিমাণ দাঁড়াবে হয়ত বহু লক্ষ কোটি কিলোমিটারের কোঠায়। এই অসীম দূরত্বের পথ পাড়ি জমাবার জন্যে যে মহাশক্তিমান রকেট যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে হবে, সে জাতীয় কোন বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীতে আমরা এখনও পরিচিত হই নি। ঐ রকেটের যাত্রীরূপে উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা কবে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছবেন তার জন্যে আমরা অহল্যার মত প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।

উড়ন্ত চাকীর ভক্তরা যে ব্যাখ্যা আমাদের দিতে চাইছেন, তার গোটা ব্যাপারটাই হল এক বিভ্রান্তি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই বিভ্রান্তির পরিচয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা তাই উড়ন্ত চাকীর প্রেমিকদের দলে নাম লেখাতে পারছি-না। এতে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন কিন্তু আমরা নিরুপায়। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদকে আমরা বর্জন করতে প্রস্তুত নই। কোনদিন যোগাযোগ স্থাপিত হলে বহির্বিশ্বের উন্নত সভ্যতার অধিকারীরাও এ পরামর্শই আমাদের দেবেন, সন্দেহ নেই।

নির্ঘণ্ট

মহাকাশের বুকে পৃথিবী

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তাকে ঘিরে আমাদের প্রশ্নের শেষ নেই। তার পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের মধ্যেই রয়েছে এক বিস্ময়ের রোমাঞ্চ। যে সূর্যের পরিবেশে আমরা বাস করি তার ভবিষ্যৎ কি, পৃথিবীর জমি, পাহাড়, মহাসাগরগুলো তৈরি হল কিভাবে, হিমাবৃত দেশ কুমেরুর পেছনে কি ইতিহাস আছে লুকিয়ে, পৃথিবী কি চিরদিন বাসযোগ্য থাকবে, পারমাণবিক মারণাস্ত্র ও তেজস্ক্রিয় উচ্ছিষ্ট মানুষের নিরাপত্তাকে কিভাবে বিপন্ন করছে, বারমুডা ট্র্যাঙ্গল ও উড়ন্ত চাকীর পেছনে রহস্যই বা কি—আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে এ জাতীয় নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে 'মহাকাশের বুকে পৃথিবী' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক শঙ্কর চক্রবর্তীর পঠন-পাঠন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্র হল বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিবিদ্যা। তবে যে পরিচয়ে সুদীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে দেশের অগণিত মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, তা হল বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়ভাবে সাধারণের দরবারে পৌঁছে দেয়া এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ার এক নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। স্লাইডযোগে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও বই লেখা, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান, সমাজসচেতনশীন বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন গড়ার পেছনে প্রেরণা যোগানো—নানা মাধ্যমে তিনি কাজ করে চলেছেন। তাঁর বয়স এখন প্রায় আটান্ন। আরো সুদীর্ঘকালব্যাপী বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজ করার পরিকল্পনা ও উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁর অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

মূল্য : তিরিশ টাকা (৩০'০০)

বেস্টবুক্‌স্

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN 81-85252-24-6